অতনু ও জীবনদেবতা

বারীন্দ্রনাথ দাশ

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক :
প্রকাশচন্দ্র সিংহ
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
জিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩।১ মোহনবাগান লেন
কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ :
এস. স্কোয়ার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাঃ লিঃ

পরিবেশক :
ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

শিল্পী

শ্রীগোপাল ঘোষ

বন্ধুবরেষু
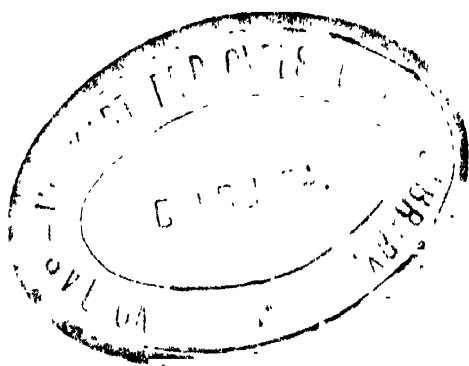
এই উপন্যাসের চরিত্র, চরিত্রের নাম, ঘটনা প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক
কোথাও কোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও আকস্মিক।

এই লেখকের অন্যান্য বই :

কর্ণফুলি

রঙের বিবি

বেগমবাহার লেন

অনুরঞ্জিতা

পূর্বরাগের ইতিহাস

অন্তরতমা

বিশাখার জন্মদিন

চায়না টাউন

রাজা ও মালিনী

মিতালী মধুর

নিশীথ নিঝুম

দুলারীবাঈ

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা

ইমন বেহাগ বাহার

চন্দ্রচকোর

বাহাদুর শার সমাধি

শাহী মহল

শাহজাদা

কথাকলির অন্যান্য উপন্যাস :

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

তারার আঁধার (২য় মুদ্রণ) ৩৷৷০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

কস্তুরীমৃগ ৪৲

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বৈশালীর দিন ৩৷৷০

বারীন্দ্রনাথ দাশের

দুলারীবাঈ ৪৲

বিমল করের

মল্লিকা ৩৲

আশাপূর্ণা দেবীর

উত্তরলিপি ৪৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

শ্রীমতী ৪৲

শৈলেশ দে-র

মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস চৌধুরী ২৷৷০

বধূ ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

জতুগৃহ ৩৸০

সুবোধ ঘোষের

কান্তিধারা ৩৲

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তৃষ্ণা ৩৷৷০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুই নদী ২৸০

শক্তিপদ রাজগুরুর

কাঁচ-কাঞ্চন ৪৲

জরাসন্ধের

আবরণ ৩৷৷০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

সুপ্তি সাগর ৪৷৷০

॥ এক ॥

অতনু মজুমদারকে সবাই প্রায় ভুলতে বসেছিলো।

তার আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে কিছু ছিলো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, আর কিছু ছিলো কয়েকজন শৌখিন সংগ্রাহকদের কাছে,—কিন্তু বেশির ভাগই ছিলো তার শ্বশুরবাড়ির ছাতের চিলেকোঠায়।

সেই ছবিগুলো ছিলো অযত্নে। তার বৌ কেতকী যদ্দিন বেঁচে ছিলো, ছবিগুলো ঝেড়েপুঁছে সাফ করে সেই ছোট ঘরখানি রেখে-ছিলো অতনুর ছবির স্থায়ী প্রদর্শনীর মত করে। বন্ধুবান্ধবেরা মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতো। কখনো কখনো কোনো বিদেশী এদেশে বেড়াতে এসে হয়তো বা কোন খাঁটি চিত্রকলারসিকের কাছে অতনুর নাম শুনে তার ছবি দেখতে এসে বিমুগ্ধ হয়ে একটা কিনে নিয়ে যেতো। মাঝে মাঝে কোনো মাসিকপত্রের তরফ থেকে লোক আসতো ছবির আলোকচিত্র গ্রহণ করবার জন্যে, তাদের কোনো বিশেষ সংখ্যায় চিত্রকলার উপর মামুলী প্রবন্ধ সচিত্র করার জন্যে।

কেতকীর মৃত্যুর পর ছবিগুলো নামিয়ে একপাশে রেখে দেওয়া হোলো গাদাবন্দী করে। ঘরখানি হয়ে উঠলো বাড়ির অন্যান্য জিনিস-পত্রের গুদাম। কেতকীর দাদা সুরজিত ছবি বুঝতো এবং ভাল-বাসতো বলে ছবিগুলো আর বেহাত হতে পারে নি, তবে অতনুর উপর তাদের সবার একটা পারিবারিক রাগ ছিলো বলে কেউ আর ছবি-গুলোর তেমন যত্ন নিতো না।

শৌখিন সংগ্রাহকদের বাড়িতে দু-চারটে ছবি যে-সব ছিলো, সে-সব ছবির দামও ওরা খুব বুঝতো বলে মনে হয় না। তাদের বেশির

ভাগই ছবি বুঝতো কম, বোঝার ভান করতো বেশি। অনেকেরই কোনো নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ছিলো না। অন্য বোদ্ধারা ভালো বলছে, খবরের কাগজে চিত্রসমালোচকেরা প্রশংসা করছে শুনলেই নিজেরাও রাতারাতি সে শিল্পীর অনুরাগী হয়ে পড়তো। সে ছিলো এমন একটা সময়, যখন ছবির প্রদর্শনীতে যাওয়া, দু-একটা ছবি কেনা এবং দুর্বোধ্য পরিভাষায় চিত্রকলা সম্বন্ধে আলোচনা করার একটা ফ্যাশান এসেছিলো এবং তারই ধাক্কায় চিত্ররসিক হওয়ার নেশা দেখা দিয়েছিলো অনেকের মধ্যে। তাদেরই কারো কারো কাছে ছিলো অতনু মজুমদারের ছবি, এক্‌জিবিশানে কেনা, যে সময় অতনু মজুমদারের ছবির একক প্রদর্শনী করলে স্টেট্‌স্‌ম্যানের মত কাগজেও দু-চার কলম ফিচার-প্রবন্ধ বেরোতো তার উপর।

কিন্তু তারপর যখন আর দেখা গেল না অতনু মজুমদারের নতুন ছবি, খবরের কাগজে পর পর কয়েক বছর ধরে তার নামের আর কোন উল্লেখ হোলো না, তখন সেই সব ফ্যাশানদারী চিত্রসংগ্রাহকেরা অনেকেই মনে করতে লাগলো যে অতনু মজুমদারের ছবি কেনার টাকাটা একেবারে জলে গেছে।

তার ছবির দাম ছিলো অন্তরঙ্গদের কাছে। ওরাই শুধু মনে রেখেছিলো যে এদেশের চিত্রকলায় সাম্প্রতিক মডার্নিস্ট-মুভমেন্টের অন্যতম পুরোধা ছিলো অতনু মজুমদার। তারই প্রচলিত এবং পরিত্যক্ত ঢঙে ছবি এঁকে দু-চারজন ভারতীয় শিল্পী অল্পবিস্তর নাম করেছে আন্তর্জাতিক চিত্ররসিক মহলে। ব্যস, এটুকুতেই এরা নিজেদের মাতিস, সেজান, ভ্যান-গগ প্রভৃতির সমগোত্রীয় ভাবতে শুরু করেছে। তাদেরই কারো কারো কাছে অতনু মজুমদারের প্রসঙ্গ তুললে ওরা যখন ভুরু কুঁচকে স্মরণ করবার চেষ্টা করে, যেন ওদের মনে পড়ছে না কোন্‌ অতনু মজুমদার, তখন অতনুর অন্তরঙ্গেরা এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে আর মনে মনে বিষণ্ণ হয়ে যায়।

কয়েক বছর এমনি কাটলো।—

তারপর হঠাৎ একদিন অতনু মজুমদারকে নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হোলো।

আমেরিকার কোনো এক স্টেটের স্টেট গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টের অধ্যক্ষ ডক্টর এ্যালেনবি এসেছিলেন ভারত সফর করতে। আধুনিক চিত্রকলার উপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অথরিটি। অনেক বছর আগে নিউ ইয়র্কে যখন ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তাঁকে নাকি বলেছিলেন, "অজন্তার ছবি, রাজপুত ছবি, মোগল ছবি, এসব নিয়ে অনেক বলা হয়েছে। আমি সমকালীন ছবির সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।"

ডক্টর কুমারস্বামী নাকি একটু হেসেছিলেন, কিছু বলেননি প্রথমটা। তারপর বললেন, "আমি যে কি দুঃখে চুপ করে থাকতে চাইছি, সে শুধু আমার অন্তর্যামী জানেন। যাই হোক—," বলে তিনি ডক্টর এ্যালেনবিকে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছবির রিপ্রোডাক্‌শান্ দেখালেন, তারপর বললেন, "আপনি কলকাতায় যান, সেখানে গিয়ে ক্যালকাটা গ্রুপের আর্টিস্টদের ছবি দেখুন। ওদের সবার নাম আমি জানিনা, তবে কয়েকজনের ছবি আমি দেখেছি। ওরা আঁকতে জানে। আর হ্যাঁ, ক্যালকাটা গ্রুপের বাইরে একজন আছে, তার নাম অতনু মজুমদার। সে কি আঁকছে, তার চাইতেও বড় কথা একদিন সে কি আঁকবে। আপনি ওর ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

কথাটা অবশ্যি অন্যের মুখে শোনা, কদ্দূর সত্যি মিথ্যে জানিনা, কারণ ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামীর কোন রচনার মধ্যে অতনু মজুদারের নাম পাওয়া যায়নি কোনোদিন। ওঁর Introduction to Indian Art বইতে যামিনী রায়, অমৃতা শেরগিল এবং ক্যালকাটা গ্রুপের গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু অতনু মজুমদারের নাম নেই। অবশ্যি, অনেকেরই নাম নেই,

যেমন সুনীলমাধব সেন। অথচ সুনীলমাধব যে সাম্প্রতিক কালের একজন গুণী শিল্পী তাতে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

যাই হোক ডক্টর এ্যালেনবি তো কলকাতায় এলেন। এসে সবারই ছবি দেখে বেড়ালেন, যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ, সুনীলমাধব ও রথীন মৈত্রের ছবি কিনলেন তাঁদের স্টেট গ্যালারি অফ মডার্ন আর্টের জন্যে, তারপর একদিন অতনুর শ্বশুরবাড়ির চিলেকোঠায় একটি মোড়ার উপর বসে অতনুর ছবি দেখতে দেখতে বললেন,—"হ্যাঁ, এই আমি খুঁজছিলাম। কোথায় এই অতনু মজুমদার?"

তাঁর ভারতীয় সঙ্গীরা এ ওর মুখের দিকে তাকালো। তারপর একজন বললো, "ও আর নেই।"

মাস তিনেক পরে নিউ ইয়র্কের জার্ন্যাল অফ মডার্ন আর্টে ডক্টর এ্যালেনবির প্রবন্ধ বেরোল অতনু মজুমদারের উপর। অনেক সাম্প্রতিক নামজাদা ভারতীয় শিল্পীর ছবি আর অতনুর ছবি পাশাপাশি রেখে আলোচনা করে দেখালেন ওরা কি ভাবে অতনুর প্রভাবে প্রভাবিত। অনেক বিদেশী মহৎ শিল্পীর ছবি আলোচনা করে দেখালেন যে, ওদের আঙ্গিক এবং বিন্যাস কিভাবে অন্যান্য সমকালীন ভারতীয় শিল্পীদের অনেক আগেই অতনুর ছবিতে এসে গেছে। এই বলে তিনি তাঁর প্রবন্ধ শেষ করলেন যে, আজ যদি অতনু মজুমদার বেঁচে থাকতো, তা হলে তার তুলি থেকে এমন ছবি বেরোতো যা তাকে এল-গ্রীকো, গোয়া, সেজান, রেনোয়ার, মাতিস, হুইস্‌লার, করব্যুসিয়ের, পিকাসো এদের সমগোত্রীয় স্বীকৃতি দিতো এবং ভারতবর্ষ তার প্রথম আন্ত-র্জাতিক সর্বকালীন শিল্পীর স্বীকৃতিতে গৌরবান্বিত হোতো।

এই প্রবন্ধের সারাংশ বেরোলো স্টেট্‌স্‌ম্যান, টাইম্‌স্‌ অফ ইণ্ডিয়ায়। এই প্রবন্ধের সমালোচনা বেরোলো মুল্করাজ আনন্দের মার্গ

পত্রিকায়। প্রবন্ধের বিরূপ সমালোচনা অনেকেই করলো, কেউ কেউ অতি তীক্ষ্ণ ভাষায়।

কোনো কোনো আর্টিস্টের রীতিমত গাত্রদাহ শুরু হোলো। অতনু মজুমদার যে কিছু নয়, তার ছবি যে কিছু নয়, এসব প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো একদল সমালোচক। কিন্তু প্রবল আলোচনা শুরু হোলো অতনুর সম্বন্ধে।

তারপর শোনা গেল যে, অতনুর ছবিগুলো অনেক দামে বিক্রি হচ্ছে। কেউ কেউ বললো, আমাদের ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারিতে ওর ছবি থাকা দরকার। কিন্তু সে প্রস্তাব শুনে কর্তৃপক্ষেরা নাক সিঁটকালো।

কিছুদিন পরে শোনা গেল অতনুর ছবি কিনছে বিদেশীরা, তার কিছু ছবি গেছে ওয়াশিংটন শিকাগোতে, কিছু ছবি লণ্ডনে প্যারিসে, কিছু মস্কোতে, আর কিছু ড্রেসডেন আর টোকিয়োতে। ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারির কর্তৃপক্ষ যখন অতনুর একটি ছবি কিনতে রাজী হোলো, তখন তার বেশির ভাগ ছবি চলে গেছে ভারতের বাইরে।

তারপর একদিন শোনা গেল, কর্তৃপক্ষ রিও-ডি-জেনিরোর এক সংগ্রাহকের কাছ থেকে অতনুর একটি ছবি কেনবার চেষ্টা করছে অনেক টাকা দিয়ে। এ নিয়ে লোকসভায় বাকবিতণ্ডা হোলো। শেষ পর্যন্ত অতনুর একটি ছবি কেনা হোলো কোন এক মন্ত্রীর শালীর সংগ্রহ থেকে। নিন্দুকেরা বলতে লাগলো সে টাকা দিয়ে নাকি অতনুর দশটা ছবি কলকাতার সংগ্রাহকদের কাছ থেকে পাওয়া যেতো।

একজন চিত্রসমালোচক রাতারাতি অথরিটি হয়ে পড়লো অতনুর ছবির উপর। সে একটি প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলো যে আর্ট গ্যালারির ছবিটা অতনুর আঁকা নয়।

আক্ষেপ করতে লাগলো সে সব চিত্রঅনুরাগীরা, যারা আগে কোনো দিন অতনুর ছবি কিনে রাখেনি। অনুতাপ করতে লাগলো সে সব সংগ্রাহকেরা, যাদের কাছে অতনুর ছবি ছিল, কিন্তু অযত্নে নষ্ট হয়ে

গেছে। দিল্লির বাঙালী মহল দুঃখ করতে লাগলো যে, আর্ট গ্যালারিতে অমৃতা শেরগিলকে অনেকখানি জায়গা দেওয়া হয়েছে, শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে তার সংরক্ষিত ছবির কক্ষটি, অথচ অতনু মজুমদারের ছবিখানি অনেক কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হয়।

আস্তে আস্তে স্বীকৃত হতে লাগলো অতনু মজুমদারের নাম।

তখন বিরূপ-পক্ষ শুরু করলো তার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে আলোচনা, সত্যি মিথ্যে জড়িয়ে অনেক কিছু। দেখা গেল সাধারণ লোক এবার সত্যি সত্যি তার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হতে শুরু করেছে।

শোনা গেল একজন বিখ্যাত প্রকাশক অতনু মজুমদারের জীবন-চরিত লেখাচ্ছে একজন নামকরা লেখককে দিয়ে।

সে হয়তো কারো কাছে শুনেছিলো যে, এক সময় আমি অতনু আর ওর স্ত্রী কেতকী, দুজনকেই খুব ভাল করে চিনতাম। আমার কাছে একদিন এলো অতনুর সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে, যদি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায়।

আমি তাকে এক কাপ চা খাইয়ে পাঠিয়ে দিলাম সুজাতাদির কাছে। সে অতনু সম্বন্ধে যা জানতে চায়, সুজাতাদি সেসব তার মনের মতন করে সাজিয়ে বলতে পারবে।

দুই ॥

বছর নয় দশ আগেকার কথা। একদিন হঠাৎ শুনলাম অতনু মজুমদার চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে কেউ জানেনা।

সকালবেলা বসে কাগজ পড়ছিলাম, এমন সময় সুজাতাদির ফোন এলো।

"শুনেছ পরিমল? অতনু চলে গেছে।"

শুনে এমন কিছু বিচলিত বোধ করলাম না। যারা অতনুকে চেনে, তার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর শুনলে বিচলিত হয় না। সে আর কয়েকবার নিরুদ্দেশ হয়েছিলো, কিন্তু কোনোবারই নিখোঁজ হয়নি।

ওর নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর শুনলে বিচলিত হয় শুধু সুজাতাদি। অতনু মজুমদার বিয়ে করে সংসার ফেঁদেছে প্রায় তিন বছর। একটি মেয়েও হয়েছে তখন।

সুজাতাদি বিয়ে করেনি। প্রফেসারি করে একটি মেয়েদের কলেজে। অতনু মজুমদারের জীবনের ছোটো বড়ো ঘটনা আমার কানে আসে বেশির ভাগ তারই মারফতে।

"এই নিয়ে বোধহয় চারবার হোলো। না?" জিজ্ঞেস করলাম সুজাতাদিকে।

একথার উত্তর সে দিলো না। বললো, "জান পরিমল? আমার মনে হচ্ছে সে আর ফিরবে না।"

সুজাতাদির গলা একটু ভারী লাগলো।

"কেন সুজাতাদি?"

"অতনু বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রত্যেকবার আমার বাড়ি এসে চা খেয়ে গেছে। এবার আসেনি।"

আমার হাসি পেলো। ভাগ্যিস কথা হচ্ছিলো টেলিফোনে। হাসিটা সুজাতাদি দেখতে পেলো না। জিজ্ঞেস করলো, "চুপ করে আছো কেন পরিমল?"

"আমি আর কি বলবো," আমি উত্তর দিলাম, "আমাদের চাইতে তুমি অনেক বেশি চেনো অতনুদাকে।"

সুজাতাদির দীর্ঘ নিশ্বাস কানে এলো।

"হ্যাঁ ভাই, ওকে শুধু আমিই চিনি। আর কেউ চেনে না। তুমি সময় পেলে একবার এসো। অনেক কথা আছে।"

সামনের দেওয়ালে অতনু মজুমদারের আঁকা একটি ছবি টাঙানো আছে। ছবির বিষয়বস্তু,—শহরের রাস্তায় এক বেলুনওয়ালা। ওই ছবি আমার এবং অতনু আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিলো বলেই আমি বলে দিতে পারি কোনটা পথ, কোনটা বেলুনওয়ালা, কোথায় তার বেলুনগুলো, বলে দিতে পারি যে ছবির ডান দিকে যে রঙের জাবড়াগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো রাস্তার ছেলেরা, যারা ছুটছে বেলুনওয়ালার পেছন পেছন।

অন্য কারো পক্ষে এটি দেখে কিছুই বলা অসম্ভব। শুধু রং,—পটভূমিকার নীল, ধূসর আর বাদামী, সেটা শহর; মাঝখানে তীব্র লাল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা, সেগুলো সব বেলুন; রঙের এপাশে ওপাশে কয়েকটা অস্পষ্ট রেখা, সেসব পথচারীদের অস্তিত্বের আভাস।—যারা বুঝতো না, জিজ্ঞেস করতো, কী আছে এই ছবিতে? আমি খুব সমঝদারের ভাব করে বলতাম, মেজাজ আছে, গতি আছে, ছন্দ আছে, ছবিতে আর কি চাই?

ছবি বোঝে এরকম একজন একদিন বলেছিলেন,—আরেকটি জিনিস চাই, সেটি ব্যালেন্স। এ ছবিতে নেই কোনো বিন্যাস-সঙ্গতি।

ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম অতনু মজুমদার নিজেও ঠিক তার ছবির মতো, শুধু রং আর রং, আর অস্পষ্ট ফর্ম।

গতি আছে, ছন্দ আছে, কিন্তু ভারসাম্য নেই। সে ছবি আঁকছে, বুঝবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পরিষ্কার করে নিজে কিছু বুঝতে পারছে না। তার সমস্ত ছবিতেই এই ব্যাকুলতা, বুঝবার চেষ্টা করছে, রঙের ভিতর দিয়ে জীবনকে টুকরো টুকরো করে ধরবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পুরো জীবনটাকে একসঙ্গে ধরতে পারছে না কোথাও।

অতনুর বৌ কেতকী আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরজিতের ছোটো বোন। ওকে খুব ছেলেবেলা থেকেই চিনি। ভাবলাম, আমার একবার যাওয়া দরকার। গিয়ে উপস্থিত হলাম সেদিন সন্ধ্যেবেলা।

কেতকী চাকরি করে এক পাবলিসিটি ফার্মে। তখন সবে অফিস থেকে ফিরেছে। খুব বিষণ্ণ উদাস তার চোখ দুটি, এ ছাড়া পারিবারিক বিপর্যয়ের আর কোনো ছাপ নেই তার মুখের উপর। সাংসারিক কাজ চলছে তার দৈনন্দিন নিয়মে। চাকর রান্না করছে রান্নাঘরে। মেয়েটি পুতুল নিয়ে খেলছে বিছানার উপর বসে।

আমায় দেখে কেতকী একটা ম্লান হাসি হাসলো।

"তাহলে তুমিও শুনেছো, পরিমলদা ?"

"হ্যাঁ, আজ সকালে সুজাতাদি ফোন করেছিলো। অতনুদার কোনো খোঁজখবর করেছো ?"

"করে কি লাভ," বললো কেতকী।

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "তোমায় কিছু বলে যায়নি ?"

খুব আস্তে কেতকী উত্তর দিলো, "একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। তাই আর খোঁজখবর করছি না। ও কোনদিন ফেরে তো নিজে থেকেই ফিরবে।"

"তবু ভালোমন্দ খবর একটা জানা তো দরকার !"

"ও যদি নিজের থেকে না জানায় তো কি করে জানবো বলো।"

ঘরের চারদিকে অতনুর আঁকা ছবি। কিছু ছবি গত বছর ওর

চিত্র প্রদর্শনীতে দেখেছি। আর কিছু নতুন, খুব সাম্প্রতিক বলে মনে হোলো। দু-তিনটি দেখলাম ভালো করে।

তারপর বললাম, "অফিস করছো ?"

"হ্যাঁ। একা একা বাড়ি বসে থেকে কি করবো ?"

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু ও চলে গেল কেন কেতকী ? তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-টগড়া হয়নি তো ?"

কেতকী তার ম্লান চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালো। বললো, "পরিমলদা, তুমি তো আমায় সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছো। আমি কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি ?"

কথাটা সত্যি। খুব শান্ত মেয়ে কেতকী। কারো সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া বিবাদ হতে দেখিনি।

খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে ও চলে গেল কেন ?"

কেতকী আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। জানলা দিয়ে তাকালো বাইরের আকাশের দিকে। ঝি এসে মেয়েটিকে ওর কোলে দিয়ে গেল।

সামনের বাড়িতে খুব জোরে রেডিও ছেড়ে দিয়েছে। পুরুষ-মেয়ের মেশানো গলায় খুব চড়া উচ্ছ্বসিত হাসি ভেসে এলো।

কেতকী খুব শান্ত গলায় বললো, "কয়েক দিন ধরে বলছিলো, ওর আর কিছুই ভালো লাগছে না। একটা পরিবর্তন চাই।"

কেতকীর চাইতে অনেক বেশী বিচলিত দেখলাম সুজাতাদিকে। আমায় দেখে রুমাল দিয়ে চোখ দুটো মুছলো।

তারপর বললো, "এই কদিন আমার এমন কান্না পাচ্ছে যে কি বলবো। সবাই কি মনে করবে, তাই লুকিয়ে বাথরুমে বসে বসে কেঁদেছি। তুমি তো সবই জানো পরিমল। কেতকী বড্ড বেশী

ছেলেমানুষ, ওর পক্ষে কি সম্ভব অতনুর মতো ছেলেকে ঘরে বেঁধে রাখা ?"

"কার পক্ষেই বা সম্ভব সুজাতাদি," আমি উত্তর দিলাম, "আজ এত বছর ধরে তো অতনুদাকে দেখছি।"

সুজাতা আমার কথার উত্তর দিলো না। বললো, "অতনু একটা পাগল। ও আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে, এ বয়েসে সেটা ক'জন পারে ? ও যা খ্যাতি অর্থ পেতে শুরু করেছিলো, রাতারাতি সেসব ছেড়ে কেউ চলে যায় ? আজ ওর ছবি কিনছে লোকে, ওকে নিয়ে আলোচনা করছে সমালোচক মহল, কতো বড়ো সম্ভাবনা এসে পড়েছিলো তার সামনে। তুমি জানো না পরিমল, ইদানিং ও যা ছবি আঁকছিলো, তাতে মনে হচ্ছিলো বিদেশে যে সাবজেক্টিভ রিয়্যালিজ্‌ম্‌এর প্রচলন হয়েছে, সেই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে সে আমাদের দেশের চিত্রকলায় একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করবে। ওর উপর আমাদের খুব ভরসা ছিলো।"

আমি একটু হাসলাম। বললাম, "ওকে দোষ দিয়ে কী হবে। মনে করা যাক, ও হয়তো এমন কিছু পেয়েছে, যার মূল্য ওর কাছে অনেক বেশী। ওকে তুমিও জানো, আমিও জানি, এমনি-এমনি ঝোঁকের মাথায় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ছেলে সে নয়।"

"তুমি জানো না পরিমল," সুজাতা বললো, "ও কতো বড়ো একটা কাজ হাতে পেয়েছিলো। প্রায় দশ হাজার টাকার মতো পেতো।"

"হয়তো এ টাকার কোনো মূল্য নেই তার কাছে।"

"স্টেট্‌স্‌ম্যান তার প্রদর্শনীর উপর এক কলম প্রশংসা লিখেছে!"

"মনে করো তার সেটা ভালো লাগেনি।"

"বাজে বোকোনা পরিমল। অন্য কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। অমন ভালো বৌ আর অমন মিষ্টি মেয়ে, তাদের অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া কি ঠিক হয়েছে ?"

"অকূলে ভাসাবে কেন সুজাতাদি? কেতকী একটা ভালো চাকরি করে। ওর বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো। ও তো আর না খেয়ে মরবে না। যদ্দিন অতনু না ফেরে তদ্দিন ওদের এমন কিছু অসুবিধে হবে না।"

সুজাতা একটু তাকিয়ে দেখলো আমায়। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কি ধারণা অতনু ফিরে আসবে?"

"তার নিরুদ্দেশ হওয়া এই তো প্রথম নয়," আমি বললাম।

একটু চুপ করে থেকে সুজাতা উত্তর দিলো, "এই শেষ, অতনু আর ফিরবে না।"

সুজাতা ঠিকই বলেছিলো। অতনু আর ফেরেনি।

কেতকী বাঁচেনি বেশীদিন। পরের বছর অসুখ করে মারা যায়। ওর মেয়ে মামার বাড়িতেই মানুষ হতে লাগলো।

অতনুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো দীর্ঘ সাত বছর পরে, উনিশশো উনষাট সালে।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা।

॥ তিন ॥

অতনু মজুমদারকে আমি প্রথম দেখি প্রায় চোদ্দো পনেরো বছর আগে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। সেটা বোধ হয় উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল। আমি তখন এম-এর ছাত্র। আমাদের সঙ্গে পড়তো অমিতাভ দত্ত। তার বাড়িতে একদিন রাত্তিরে তার ছোটো বোন তপতীর জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের সবার নেমন্তন্ন।

ঘরদোর একটু ভালো করে সাজাতে হবে বলে আমি, সুরজিত আর কেতকী গিয়েছিলাম সন্ধ্যার আগেই। অমিতাভ আমাদের বলে দিয়েছিলো যাওয়ার সময় আমরা যেন ফুল কিনে নিয়ে যাই মার্কেট থেকে। ওদের বাড়িতে ভালো ফুলদানি নেই বলে আমরা ফুলদানিও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম।

অমিতাভর দিদি কল্যাণী সুজাতাদির বন্ধু। সুজাতাদিও ছিলো সেখানে। আমরা কজনা খুব হৈ চৈ করে আট দশটা ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখলাম। অমিতাভ আর তপতীর কাছে শুনলাম, সেদিন একজন খুব আকর্ষণীয় অতিথি আসছে। সে আর্টিস্ট, অতনু মজুমদার তার নাম।

চিত্রকলা সম্বন্ধে সুজাতাদির একটা আগ্রহ ছিলো। ছবির এগজিবিশানে যাওয়া, আর্ট আলোচনা করা তখন একটু একটু করে ফ্যাশান হয়ে উঠছে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে। আমরা তখন নাম জানি শুধু অবন ঠাকুর, গগন ঠাকুর আর নন্দলাল বোসের। বিদেশী আর্টিস্টদের মধ্যে নাম শুনেছি লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, র‍্যাফেল আর মাইকেলেঞ্জিলোর। মাঝে মাঝে অভিজাত মাসিকপত্রের দুর্বোধ্য প্রবন্ধে হয়তো মানেৎ, দেগা, সেজান, ভ্যান গগের নাম

পেয়েছি,—কিন্তু মনে রাখিনি। সমারসেট মমের উপন্যাস পড়ে গগ্যাঁ সম্বন্ধে একটু আগ্রহান্বিত হয়েছি। শুনেছি, পিকাসো নামে কে একজন নাকি এমন সব অদ্ভুত ছবি আঁকে যার মানে বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন বলে শুনেছি, কিন্তু সে যে কবির অবসর বিনোদনের একটি খেয়াল মাত্র নয়, আরো অনেক বেশী মূল্যবান কিছু, সে কথা কারো মুখে বড়ো একটা শুনিনি। যামিনী রায় তখনো বাগবাজারের অধিবাসী, ওঁর ছবি আমেরিকানরা খুব কিনছে বলে শোনা যাচ্ছে, সাধারণ লোকে একটু একটু করে আগ্রহান্বিত হতে শুরু করেছে যামিনী রায় সম্বন্ধে।

সে সময় সুজাতাদি, কল্যাণীদি আর ওদের বন্ধুবান্ধবেরা কিউবিজ্‌ম্‌, ইম্প্রেশানিজ্‌ম্‌, ফিউচারিজ্‌ম্‌, এক্সপ্রেশানিজ্‌ম্‌ ইত্যাদির আলোচনা করে আমাদের চমক লাগিয়ে দিতো। সুজাতাদি আমাদের আর্টে আগ্রহান্বিত করবার চেষ্টা করেছিলো। আর্টের বই এনে ছবি দেখাতো মাঝে মাঝে। প্রায়ই বুঝতাম না। কখনো কখনো হাসি পেতো। সালভাডর ডালির City of drawyers দেখে ভাবতাম, একটি মেয়েমানুষের বুক পেট জুড়ে শুধু ড্রয়ারের পর ড্রয়ার, এর মানে কি? একে ছবি বলছে কেন? পিকাসোর Night fishing at Antibes দেখে ভাবলাম কোথায় মাছ, কে কাকে ধরছে, ছবি জুড়ে শুধু নীল, বেগুনী আর সবুজ রঙের খাম-খেয়ালী বিন্যাস। সুজাতাদি একদিন আমাদের দেখালো রুমানীয়ান ভাস্কর Bruncusiর Bird in spaceএর ছবি। মনে হোলো যেন একটি লম্বা পাতা একটু বেঁকিয়ে রাখলে যে রকম দেখায় ঠিক তেমনি।

পাখি কোথায়?—জিজ্ঞেস করলো তপতী।

স্পেস্‌ কোথায়?—জিজ্ঞেস করলো অমিতাভ।

কল্যাণীদি ক্ষেপে গেল। বললো, Bird in space বোঝানোর জন্যে যদি আকাশ আঁকতে হয় তাহলে সেটা আর্ট হোলো কিসের?

কেন হোলো না সেকথা আমরা বুঝতে পারলাম না।

সুজাতাদি বললো, একটা পাখি ওখানে বসেছিলো। সেটা উড়ে গেল। এই যে হঠাৎ অসীমের মধ্যে মুক্তি পাওয়ার ব্যাকুলতা, হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ, এ তো আর আকাশে পাখি এঁকে বোঝানো যাবে না। পাখি উড়ে গেল, এই ভাবটা পুরোপুরি ধরা হয়েছে এই ব্রোঞ্জের টুকরোর মধ্যে, তাই এটা সার্থক শিল্পসৃষ্টি।

বলা বাহুল্য আমরা কিছুই বুঝলাম না। ওদের আড়ালে হাসাহাসি করলাম খুব। অমিতাভ ঠাট্টা করে বলতো, এই যদি আর্ট হয় তাহলে তো শুধু একটি কলা এঁকে কলা বোঝানো যাবে না, একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এঁকে দেখাতে হবে। তাহলে কলার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত দুটো রূপই পরিস্ফুট হবে।

যাই হোক, সুজাতাদিরা ছিলো আর্টের সমঝদার, ওদের কথা আমরা বুঝি বা না বুঝি, ওদের দুর্বোধ্য কথাবার্তার জন্যে খুব সমীহ করতাম।

অমিতাভ যখন বললো, তাদের বাড়িতে সেদিন একজন আর্টিস্ট আসছে, অতনু মজুমদার তার নাম, তখন সুজাতাদি ভুরু কুঁচকে বললো, "অতনু হোয়াট? মজুমদার? কই নাম শুনিনি তো?"

সুজাতাদি যখন বললে নাম শোনেনি, তখন আমরাও মেনে নিলাম যে, নিশ্চয়ই একজন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মনুষ্য।

দেখলাম কল্যাণীদির কান দুটো লাল হয়ে গেল। বললো, "কোত্থেকে শুনবে? খুব ইদানিংকালের আর্ট সম্বন্ধে বেশি খোঁজখবর তো রাখো না।"

"ওর কি কোনো একজিবিশান হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো সুজাতাদি।

"ও নতুন এসেছে কলকাতায়।"

"কোথায় ছিলো এদ্দিন? মফস্বলে?"

"প্যারিসে," সগর্বে উত্তর দিলো অমিতাভ। তপতী গিয়ে একটি

ম্যাগাজিন নিয়ে এলো। খুলে দেখি ফরাসী ভাষার ম্যাগাজিন। অসংখ্য ছবিতে ভর্তি।

অমিতাভ কয়েকটি ছবির নিচে নাম দেখালো। দেখলাম লেখা আছে, অতনু মজুমদার। ছবির বিবরণ সব ফরাসী ভাষায়।

সবাই ঝুঁকে পড়ে ছবিগুলো দেখলাম। কিছুই বুঝলাম না সেসব ছবির মর্ম। শুধু রং আর রং, উগ্র লালের প্রাচুর্য। তবু যে বিদেশী আর্ট জার্নালে আমাদের দেশের একজন শিল্পীর ছবি দেখতে পেলাম, তাইতেই গর্বে বুক ভরে উঠলো।

সুজাতাদি ছবিগুলো দূরে রেখে, কাছে রেখে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। বললো, "হ্যাঁ, ছবিগুলো ভালোই বলতে হবে। তবে তুলির টান এখনও জোরালো নয়। পার্সপেক্টিভ এভাবে বিকৃত করেছেন কেন? দরকার ছিলো কি? এই সবুজটা সুন্দর, কিন্তু এখানে কালো কেন? বড় শিল্পী কি কোনোদিন কালো রং ব্যবহার করে? যাই হোক, তবু এদ্দিনে একজনকে দেখলাম, যে সত্যিকারের ছবি আঁকবার চেষ্টা করছে। আমাদের এসময়কার শিল্পীরা কি ছবি আঁকে? রং তুলি নিয়ে শুধু ছেলেখেলা করে। ওদের মিডিয়ামের সঙ্গে এখনকার যুগধর্মের কোনো সঙ্গতি নেই। শুধু নয়নাভিরাম হলেই ছবি হয় না। ছবিকে একটা কিছু বলতে হবে, খুব বলিষ্ঠ ভাষায় বলতে হবে। যে ছবি দেখলাম তার মধ্যে যদি আমার নিজের অন্তর্জীবনের কোনো একটা দিক অনুভব করতে না পাই, তাকে আমি ছবি বলে মানবো কেন? আমাদের এখানে ছবি এঁকেছেন শুধু রবীন্দ্রনাথ। আর কেউ ছবি আঁকতে জানে না।"

সুজাতাদির এসব কথা শুনতে আমরা অভ্যস্ত। কথাগুলো মানি না, কিন্তু প্রতিবাদ করবার ভাষাটা আমাদের দখলে নয়। সুতরাং চুপ করে শুনে যাই। আজও কিছু বললাম না।

কল্যাণীদি খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার ভালো লেগেছে অতনুর ছবি?"

সুজাতা কল্যাণীর দিকে একটু তাকালো। তারপর হেসে ফেললো। বললো, "এর কথা তো তুমি আমায় কোনোদিন বলো নি।"

"ভেবেছিলাম ও প্যারিস থেকে ফিরে এলে বলবো," কল্যাণী উত্তর দিলো। "ও আমাদের অনেকদিনের চেনা। মাসীমার ভাসুরপো সম্পর্কে।"

"ম্।" সুজাতা একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "উনি প্যারিসে ছিলেন কদ্দিন?"

"প্রায় বারো বছর। সেই আঠার বছর বয়েসে গেছেন। আর এই মাসখানেক হোলো ফিরলেন। এখন ওঁর তিরিশ একত্রিশ বয়েস।"

"এই যে অতনুদা, আসুন, আসুন," অমিতাভ দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, "আপনার কথাই হচ্ছিলো এতক্ষণ।"

আমরা তাকিয়ে দেখলাম।

এমন কিছু ফরাসী-ফেরত ছাপ নেই চেহারার মধ্যে। আর্টিস্ট বলতে যে চেহারা আমরা মনে মনে কল্পনা করে নিই, কোনো মিল নেই তার সঙ্গে। পরনে খদ্দরের পাঞ্জাবী। একটু ময়লা। তাঁতের ধুতি মালকোচা মেরে পরা। মাথার চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। চোখ দুটো ছোট ছোট, কিন্তু জ্বলজ্বল করছে। রুক্ষ কঠিন মুখ, কিন্তু হাসি ঝিলমিল করছে ঠোঁটের কোণে। চওড়া বুক, বলিষ্ঠ বাহু। চোখ দুটো অত জ্বলজ্বলে না হলে স্বচ্ছন্দে কোনো স্কুলের ড্রয়িং অ্যাণ্ড ড্রিল মাস্টার মনে করতে পারতাম।

অমিতাভ অতনু মজুমদারের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলো।

সুজাতা বললো, "কল্যাণী এতক্ষণ আপনার ছবি দেখাচ্ছিলো আমাদের। সত্যি, অপূর্ব।"

"অপূর্ব?" ভারী গলা অতনু মজুমদারের। "কেন?"

"কী সুন্দর রং, কী আশ্চর্য কম্পোজিশান, কী চমৎকার ফর্মের ব্যালেন্স।"

আমি অবাক হলাম। এই একটু আগে সুজাতাদি খুঁত বার করছিলো অতনুর ছবির।

সুজাতাদির কথায় বাধা দিয়ে অতনু বললো, "রং আর কম্পো-জিশানের কী বোঝেন?"

মুখে তার আশ্চর্য হাসিটা না থাকলে ওর কথায় রীতিমত আহত হওয়া যায়।

সুজাতাদির মুখে কোন কথা এলো না।

কথা বলবার কোনো অবকাশও দিলো না অতনু মজুমদার। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ফুলদানিতে ফুল কে সাজিয়েছে?"

"আমরা সবাই মিলে সাজিয়েছি।"

"এভাবে ফুল সাজায়?"

আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম।

"কী অসহ্য বিচ্ছিরী ফুলদানি," বললো অতনু।

কেতকীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আমরা ভেবে পেলাম না ফুলদানিগুলো খারাপ কিসের। কেতকীর খুব ফুলদানির শখ আছে। সে বাছাই করে ফুলদানি কিনেছে।

"একটা লম্বাটে আধারের মধ্যে একগোছা ফুল গুঁজে দিলেই সেটা ফুল-সাজানো হয় না," অতনু মজুমদার বলে চললো, "আমি অবাক হয়ে যাই, এখানকার লোকে ফুল ভালবাসে না কেন? বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে পর্যন্ত দেখি ড্রয়িং-রুমে ফুলদানিতে কাগজের ফুল। অসহ্য! আর সত্যিকারের ফুল দিয়ে কেউ যদি ফুলদানি সাজায়ও বা, সেও ওই একগোছা ফুল নিয়ে ফুলদানিতে ঠেসে দেওয়া। সেদিন এক বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে দেখলাম এক এক বাণ্ডিল ফুল, হ্যাঁ, বাণ্ডিলই বলবো তাকে, এক এক বাণ্ডিল ফুল

জরি-টরি দিয়ে মুড়ে মুড়ে সব ফুলদানিতে ঠুসে দিয়েছে। আর, আহা, সেও কি ফুলদানি! লাল নীল কাচের পেট-মোটা ফুলদানি, তাতে আবার গোলাপ ফুল আর পাতার নক্সা। ওই এক প্যাটার্নের ফুলদানি সব বাড়িতে।"

সে রকম ফুলদানি কেতকীও এনেছিলো গোটা কয়েক। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এগুলোতে চলবে না? কি করবো তাহলে?"

"ফেলে দাও, সব ছুঁড়ে ফেলে দাও। কী সুন্দর রজনীগন্ধা, কিন্তু কী জঘন্য করে সাজানো। ওই চোঙার মধ্যে রজনীগন্ধার কয়েকটি ডাঁটি ভরে দিলেই সেটা সাজানো হোলো?"

আমরা সবাই চুপচাপ। কী বলবো। চিরকাল সর্বত্র দেখে এসেছি, এভাবেই তো ফুলদানিতে ফুল সাজানো হয়।

"আপনি সাজিয়ে দিন না," তপতী বললো।

"তা তো দেবোই। এই দুঃসহ দৃশ্য আমি সহ্য করবো নাকি?"

অতনু চারদিকে ঘুরে ঘুরে ফুলদানিগুলো থেকে সব ফুলগুলো বার করে নিলো। বললো, "এসব ফুলদানি চলবে না। সরাও এখান থেকে। আচ্ছা এই বোতলটা থাক। অন্যগুলো হটাও।"

সব সরানো হোলো।

"কিন্তু ফুলদানি তো আর নেই," তপতী বললো।

"সে ব্যবস্থা আমি করছি।"

তারপর ঘণ্টাখানেক বসে দেখলাম অতনু মজুমদারের ফুল সাজানো। বাড়ির ভেতর ঘুরে ঘুরে অতনু সংগ্রহ করে নিয়ে এলো রঙিন বোতল, কাচের জার, কাচের জগ, চায়ের পেয়ালা পিরিচ, স্যুপ-বোল, কারি-বোল, কাচের বীকার।

"বাড়ির পেছনে কচু গাছ আছে। নিয়ে আয় চার পাঁচটা কচু-পাতা। পাতাবাহারের পাতাও কিছু নিয়ে আয়। কাঁচি নিয়ে আয়, টেপ নিয়ে আয়, সবুজ সুতো নিয়ে আয়। আলপিন নিয়ে আয়।—পিন হোল্ডার আছে?"

"পিন হোল্ডার? সে আবার কি?"

"থাক, বুঝেছি, তোরা জন্মেও নাম শুনিস নি। এই ফ্রুট-ডিশে যে ফুল সাজাবো, ফুলগুলো দাঁড়াবে কিসের উপর?"

"সে তো আমরাও ভাবছি।"

"দাঁড়া, একটা বড়ো টম্যাটো নিয়ে আয়।"

টম্যাটো এলো।

টম্যাটোর মধ্যে একটু ফুটো করে একটি লম্বা লিলি ডাঁটি-শুদ্ধ তার মধ্যে গুঁজে দিলো অতনু। একপাশে গুঁজে দিলো একটি ক্রোটোনের পাতা। তারপর একটি বাটার ডিসের মধ্যে সেটি বসিয়ে কোণের টেবিলের উপর নিয়ে রাখলো।

"একটা কমলালেবু নিয়ে আয়।"

কমলালেবু এলো।

"খোসা না ছাড়িয়ে ভেতরের কোয়াগুলো বার করে নিতে পারবি?"

এ ওর মুখের দিকে তাকালো।

"একটা চামচে এনে দে। আর একটা ছুরি।"

কমলালেবুর মুখের দিকে একটি পয়সার সমান ছ্যাঁদা করে চামচেটা ভেতরে ঢুকিয়ে কোয়াগুলো একটা একটা করে বার করে আনলো সে। তারপর আস্ত খোসাটার মধ্যে জল ভরে দিয়ে রঙিন ফুলের দুটো লাল ও একটি সাদা স্তবক উঁচু নিচু করে গুঁজে দিলো।

"এটা ওই কোণে নিয়ে রাখ।"

দুটো কাচের বীকারে জল ভরে সরু কুমড়োলতায় গোলাপ ফুল পিন দিয়ে বেঁধে সেগুলো লতিয়ে লতিয়ে সাজিয়ে দিলো বীকারের ভেতর

"এ দুটো তাকের ওপর রেখে দে।—আলু নিয়ে আয় কয়েকটা।"

আলু এলো। সেগুলো দু-দু টুকরো করে কাটা গেল।

"পিন হোল্ডার যখন নেই, তখন আলু দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ওই বোল্‌টা দে।"

তিনটে রজনীগন্ধার ডাঁটি নিয়ে ছোট বড়ো মাঝারী, এই তিন মাপে কাটলো অতনু। হাত দিয়ে চাপ দিয়ে একটু একটু করে বেঁকিয়ে সেগুলো বসাতে লাগলো।

"এটা, বুঝলি, স্বর্গ। এটা পৃথিবী। এটা মানুষ।"

ছোটো ছোটো লিলির ডাঁটি তুলে নিলো।

"এটা ওর স্ত্রী, এটা মাঠ।"

খুব লম্বা ডাঁটির একটি মানকচুর পাতা একদিকে ছড়িয়ে দিলো, অন্যদিকে একটি খাটো ডাঁটি।

"ছাখ, এই ধরনটা হচ্ছে জাপানী। ফুল সাজানো কাকে বলে যদি শিখতে চাস তো জাপানে যা।"

গোলাপ ফুলগুলো পড়ে ছিলো।

"এগুলো কোথায় দিবি? আচ্ছা, এক কাজ কর, পূজোর ঘর থেকে বড় শাঁখটা নিয়ে আয়।"

শাঁখটা উল্টো করে বসিয়ে তাতে তিনটি গোলাপ ফুল সাজিয়ে দেওয়া হলো, চার পাঁচটা পাতা গুঁজে দেওয়া হলো চারদিকে, একটি গোলাপের পাঁপড়িগুলো ছিঁড়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হোলো।

আর কিছু গোলাপ নিয়ে পাতলা তার জড়িয়ে জড়িয়ে বিভিন্ন আকারে মুড়ে লতিয়ে বেঁকিয়ে সেগুলো সাজিয়ে দিলো একটি কাচের জাগে। তারপর সেটা নিয়ে রাখলো ঘরের কোণে। তার পেছনে দাঁড় করালো একটি ছোট গোল আয়না। সমস্ত ঘরের গভীরতা যেন শুধু সেই আয়নার পরিস্থাপনায় বেড়ে গেল।

এমনি করে নানারকম বিন্যাসে নানারকম আধারে ফুল সাজালো অতনু মজুমদার। বুদ্ধের একটি মূর্তির পাশে তিনটে পদ্মফুল সাজালো, —একটি প্রস্ফুটিত, একটি কলি, আরেকটির পাঁপড়ি ছিড়ে ফেলে শুধু তার ভিতরটা।

বললো, "এটি বর্তমান, এটি ভবিষ্যত, ওটি অতীত। তিনটি কালের রূপক এই তিনটি পদ্ম। এর পাশে ধ্যানী বুদ্ধ বিরাজ করছেন কালাতীত হয়ে।"

সামনে জ্বালিয়ে দিলো একটি ধূপকাঠি আর তুটো মোমবাতি,— একটি বড়, একটি ছোটো।

সমস্ত ঘরের চেহারা যেন বদলে গেল। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম আমরা সবাই।

"কী দেখছিস," অতনু বললো তপতী আর অমিতাকে, "যদি আমায় ফুল বেছে আনতে দেওয়া হোতো, তাহলে আমি এখানে স্বর্গ বানিয়ে তুলতাম। তোরা যা এনেছিস প্রায় সবই তো শৌখীন বিলিতী ফুল। আমি আনতাম আমাদের দিশী ফুল,—গ্যাঁদা, জবা, চাঁপা, পলাশ, কুমড়োর ফুল, কচুরিপানার ফুল আর পাতা, এই সব। ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেণ্ট কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিতাম। তোরা তো কেউ ফুল ভালোবাসিস'না। ফুল দিয়ে ঘর সাজাতে হলে ফুল ভালোবাসতে হয়।"

আমরা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম, শিল্পী এবং শিল্পকে ভালোবাসলে শিল্পীর দম্ভও অল্পবিস্তর সইতে হয়।

অতনু গ্যাঁট হয়ে একটি চেয়ারে বসলো। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে বললো, "এবার চা খাওয়া।"

তপতী এসে অতনুকে একটা প্রণাম করলো।

"কি হোলো রে?"

"বা রে, আজ যে আমার জন্মদিন সে কথা ভুলে গেলেন নাকি?"

"ও হ্যাঁ, তাই তো! আরে, আসল কথাটাই তো ভুলে গেছি। তোকে কি প্রেজেণ্ট দেওয়া যায়? আচ্ছা, একটা কাগজ এনে দে।"

তপতীর ছোটো বোনের বড়ো ম্যাপ-ড্রয়িং খাতাটা এনে দেওয়া হোলো। তার থেকে সন্তর্পণে একটা পাতা বার করে নিয়ে, নিজের

পকেট থেকে কলম বার করে অতনু স্কেচ করতে লাগলো আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে।—কিছুক্ষণ পর ছবির নিচে কিছু একটা লিখে সেটি দিলো তপতীর হাতে।

"কি ছবি এটা ? আরে, এ তো আমার ছবি বলে মনে হচ্ছে !"

আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লাম। হ্যাঁ, তপতীরই ছবি। ছবিটা দেখলেই মনে হবে তপতী মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে খুব আনমনে ভাবছে একটি মিষ্টি মধুর ভাবনা।

কিন্তু—!

এই কিন্তুটাই সেদিন নেমন্তন্নে প্রায় সব অতিথিই বললো।

প্রত্যেক অভ্যাগতই ঘরে ঢুকে বললো, "বাঃ, কি চমৎকার ফুল-সাজানো ! আশ্চর্য ! কে করেছে ?"

তারপর টেবিলের উপর ছবিটা দেখে বললো, "এ তো তপতীর ছবি ! কিন্তু—"

কিন্তু কি ?—প্রত্যেকে ওই একই কথাই বললো। তপতীর চোখ তো এরকম নয়। তপতীর নাকের সঙ্গে তো ছবির নাকের কোনো মিল নেই। তপতীর চিবুক বুঝি এরকম ? ছবির ঠোঁট তো তপতীর ঠোঁটের মতো হয়নি।

নাই বা হোলো। ছবি দেখে তো প্রথমেই মনে হচ্ছে ওটা তপতীর ছবি। কেউ তো বলছে না ওটা সুজাতা বা কেতকী বা কল্যাণী। কেউ তো বলছে না এ এক সাঁওতাল কুলি-কামিনের পোর্ট্রেট।

খেতে খেতে কয়েকজন অতনুর সঙ্গে তর্ক ফেঁদেছিলো মডার্ন-আর্ট নিয়ে।

চিত্রকলার দুর্বোধ্য এটা ওটা সেটা অনেক কিছু বলে সব শেষে অতনু তার ভাষা সহজ করে বললো, "আমাদের ছবি কি রকম জানেন ? ঠিক ওই তপতীর ছবির মত। যে তপতীকে চেনে, দেখেই বলবে, আরে, এ তো আমাদের তপতী। তারপর খুঁটিয়ে দেখতে

গিয়ে মনে হবে, তপতীর সঙ্গে তো এটা ওটা সেটা মেলেনি। ঠিক তেমনি আমাদের ছবিতে একটুখানি রং দেখে বলবেন, এ তো কৃষ্ণ-চূড়া, কিন্তু কৃষ্ণচূড়া বুঝি এরকম?—আসল কথাটা কি জানেন? আপনার মনের চোখ দিয়ে আপনি তপতীকে যেরকম দেখছেন, আমার আঁকা স্কেচের সঙ্গে তার মিল আছে বলেই আপনি চট করে বলছেন ওটা তপতীর ছবি। তারপর যেই দেখছেন, আপনার বাইরের চোখ দিয়ে যা দেখছেন তার সঙ্গে তপতীর ছবির কোন মিল নেই, অমনি আপনার সংস্কার আপনাকে এ ছবি তপতীর বলে মেনে নিতে দিচ্ছে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই হোলো মডার্ন আর্টের মূল কথা। যেটা বাহ্য, সেটা আমাদের কাছে গৌণ। সব আকার এবং বিন্যাসের ভিতর যে অন্তর্নিহিত প্রাণ, আমরা সেটা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি আমাদের তুলিতে।—এবং পারিও, আমাদের পূর্বসূরীদের চাইতে অনেক ভালো পারি।”

“আপনাদের ছবির কিছু বুঝি না মশাই,” বললেন একজন অধ্যাপক।

“বুঝতে হলে কিছু চর্চা থাকা দরকার,” অতনু মজুমদার উত্তর দিল, “আহিড়ী-টোড়ি কি চন্দ্রকোশের একটি ভাল খেয়াল কি সবাই বোঝে?”

“শুনতে ভালো লাগলেই সেটা গান,” বলে উঠলেন একজন মহিলা, “তেমনি চোখে ভালো লাগলেই সেটি ছবি।”

“সত্যি সত্যি তা নয় কিন্তু,” অতনু আস্তে আস্তে বললো, “ব্যক্তিগত রুচির উঁচু নিচু মান আছে। ভালো খেয়ালের চাইতে সিনেমার হাল্কা গান অনেকের বেশী পছন্দ, ছবির বেলায়ও তাই। অমার্জিত রুচি নিয়ে উঁচু দরের জিনিস উপভোগ করা যায় না। ভাল গানের সমঝদার হতে হলে কান তৈরী করতে হয়। তেমনি ভালো ছবির সমঝদার হতে হলে চোখ তৈরী করতে হয়।”

অতনুর কথা শুনে চটে গেলেন আরেকজন। বললেন, “আপনাদের

মত মডার্নিস্টদের ছবি ভালো না লাগলেই যে আমাদের রুচি যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত নয় বা আমাদের ছবি বুঝবার চোখ নেই, একথা মানবো কেন? অজন্তার ছবি আমাদের ভালো লাগে, র‍্যাফেল মাইকেলেঞ্জিলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ভ্যান ডাইকের ছবি আমাদের ভালো লাগে, চীনে ছবি, জাপানী ছবি আমরা খুব উপভোগ করি, বাইজেণ্টাইন্ আর্ট আমাদের মুগ্ধ করে, মুঘল ছবি, কাংরা ছবি, রাজপুত ছবি আমাদের সৌন্দর্যপিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করে, অবন ঠাকুরের ছবি, নন্দলাল বোসের ছবি, যামিনী রায়ের ছবির অনুরাগী আমরা,—আর আপনাদের কয়েকজনের অর্থহীন এলোমেলো রঙের আঁচড় দেখলে সেটা ছবি বলে মেনে নিতে পারি না বলে আপনি বলতে চান আমাদের রুচি অমার্জিত?"

সবাই অতনুর দিকে তাকালো।

অতনু একটু হাসলো, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, পিকাসোর ছবি আপনার ভালো লাগে? স্যালভাডর ডালির ছবি? রবীন্দ্রনাথের ছবি?"

ভদ্রলোক কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। অতনু বাধা দিয়ে বলে গেল, "সত্যি সত্যি বলুন, ওঁরা সবাই বিশ্ববিখ্যাত এবং স্বীকৃত শিল্পী বলে আপনার মনের কথাটা বলতে দ্বিধাবোধ করবেন না।"

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন, "সবাই যখন বলছে, তখন ওঁরা নিশ্চয়ই খুব বড়ো শিল্পী। কিন্তু ওঁদের ছবি কিচ্ছু বুঝি না মশাই।

"সবাই যখন বলছে!" অতনু হেসে ফেললো, "জানেন, একদল লোক আছে যারা ছবি সত্যি সত্যি বোঝে। প্রস্তর যুগের গুহামানবের আঁকা ছবিও ওদের ভালো লাগে, রেনেসাঁস যুগের শিল্পীদের ছবিও ভালো লাগে, আবার সাম্প্রতিক কালের ছবিও ভালো লাগে। যে কোন ভালো ছবির যে রসগ্রাহিতা আর প্রসাদগুণ, সেটা সব দেশের সর্বকালের ভালো ছবিতেই আছে, তার আঙ্গিক এবং শিল্পরীতি যাই হোক না কেন।"

অতনুর কথা শুনতে শুনতে সুজাতাদি একটু একটু হাসছিলো। দেখলাম, কল্যাণীদি খুব বিহ্বল হয়ে গিলছে অতনুর কথা।

অতনু বলে গেল, "আরেকদল লোক আছে, যাদের কোনো নিজস্ব বিচারবুদ্ধি নেই কোনো ছবি ভাল বলে স্বীকার করা বা না-করার ব্যাপারে। ওই যে একটা কথা বলেছেন—সবাই বলছে। সবাই যখন বলছে, তখন আর উড়িয়ে দেবেন কিসের জোরে? অবন ঠাকুর যখন প্রথম আঁকতে শুরু করেছিলেন আমাদের ক্লাসিক্যাল অঙ্কন রীতিতে, তখন রবি বর্মার রাজত্ব, ওই ধাঁচের ছবি লোকের ভালো লাগতো, কেউ সহ্য করতে পারলো না নতুন অঙ্কন রীতি। সাধারণ লোকে তো হাসাহাসি করতো, বলত, এ কী উদ্ভট ঢং, প্যাঁকাটির মত সরু লতানো বাঁকানো গড়ন, অবাস্তব চোখ নাক আর হাতের আঙুল। আজ বলছেন, ওঁর ছবি আপনাদের ভালো লাগে।"

"প্রতিভা তার স্বীকৃতি একদিন পাবেই", একজন বলে উঠলো।

"আমিও সেকথাই বলতে চাইছি", অতনু বললো, "তবে যে বোঝে তার কাছে স্বীকৃতি পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে, যে বোঝে না তার কাছে পাওয়া যায় আর দশজনের কাছ থেকে পাওয়ার পরে।"

তর্কে আর বিতর্কে খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হোলো। সব শেষে অতনু বললো সুজাতাদিকে, "তাই বলছিলাম, সুরের রস উপভোগ করবার জন্যে কান তৈরী করতে হয়, রঙের রস উপভোগ করবার জন্যে তৈরী করতে হয় চোখ। মিঞা-কি-মল্লারের কোমল গান্ধার আর দরবারী-কানাড়ার কোমল গান্ধারের মধ্যে কি তফাৎ সেটা যে বোঝে না, বাহারের কোমল আর শুদ্ধ নিখাদ আর মিঞা-কি-মল্লারের কোমল আর শুদ্ধ নিখাদের বিন্যাসে কি তফাৎ সেটা যার জানা নেই, সে শুধু গান শুনে গান ভালো লাগলো ভেবেই পরিতৃপ্ত থাকবে, সুরের সমুদ্রে কোনোদিন সাঁতার কাটতে পারবে না।"

অতিথিদের অনেকেই চলে যাওয়ার পর অন্তরঙ্গ আমরা কয়েকজন

যখন রইলাম, কেতকী আস্তে আস্তে অতনুর পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর খুব নরম গলায় বললো; "একদিন আপনার ছবি দেখতে যাবো।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবে," বলে আমার আর সুরজিতের দিকে ফিরে অতনু বললো, "তোমরাও এসো।" তারপর আবার কেতকীর দিকে ফিরে বললো, "তোমায় আমি ফুল-সাজান শিখিয়ে দেব।"

আমার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো সুজাতাদি। সে বলে উঠলো, "অতনু বাবু, একদিন আমাদের বাড়ি আসুন না। বাবার খুব ভালো ছবির সংগ্রহ আছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হবেন। আর আমারও খুব আগ্রহ আছে মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে।"

কল্যাণী সুজাতার দিকে একটা কটাক্ষ হানলো। তারপর বলে উঠলো অতনু কোন উত্তর দেওয়ার আগেই, "অতনুদার কি এখন সময় হবে? শিগগিরই ওঁর ছবির একজিবিশান হবে আর্টিস্ট্রী হাউসে। তাই এখন খুব ব্যস্ত।"

অতনু তাড়াতাড়ি কি যেন বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই সুজাতাদিও উত্তর দিলো কল্যাণীকে কটাক্ষ বিদ্ধ করে, "অতনুবাবু যদি এতই ব্যস্ত থাকেন যে, একলা আসার সময় তাঁর হবে না, তাহলে কল্যাণীকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন।"

কথাগুলো হাল্কাভাবে বলা হলে খুব সহজ ঠাট্টা বলেই মনে করতাম, কারণ সুজাতা আর কল্যাণী খুব বন্ধু। কিন্তু দুজনের কথাতেই একটা সূক্ষ্ম ধার ছিলো যেটা আমরা অনুভব করে একটু অবাক হলাম। কল্যাণীর চোখ মুখ লাল হোলো, কিন্তু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো অতনু মজুমদার। হাসতে হাসতে বললো, "ব্যস্ত তো বটেই, এবং তাই নিয়ে কল্যাণীর অনুযোগের অন্ত নেই। কেন, আপনারা কিছু শোনেন নি?"

"থাক তোমায় আর কিছু শোনাতে হবে না", বলে উঠলো কল্যাণী।

"কেন, অত সঙ্কোচ কিসের", অতনু বললো, "আজ না হোক কাল তোমার বন্ধুরা তো জানবেই। দিন পর্যন্ত যখন প্রায় ঠিক হয়ে গেছে, তখন জানাতে আর আপত্তি কি ?"

"তুমি ভারী অসভ্য," কল্যাণী মুখ লাল করে বললো।

সুতরাং আমাদের আর কিছু জানতে বাকী রইলো না।

সুজাতা হাসতে হাসতে বলল, "তোর সঙ্গে ঝগড়া করবো কল্যাণী। এদ্দিন বলিসনি কেন ?"

অতনু সুজাতাকে বললো, "নিশ্চয়ই আসবো আপনার বাড়ি। কবে আসবো বলুন।"

সুজাতা ভাবছিলো। উত্তর দেওয়ার আগেই অতনু বলে উঠলো, "আচ্ছা, আমিই বলছি। পরশু বিকেলে, কেমন ? একলাই আসবো। আপনার বাবা যদি থাকেন তো তাঁর সঙ্গে আলাপ করে নিশ্চয়ই খুশি হবো, তবে যদি না থাকেন তাহলে আরও বেশি খুশি হবো।"

একথা আমরা সহজ ঠাট্টার মত নিয়ে হেসে উঠলাম সবাই, কিন্তু দেখলাম সেই উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে সুজাতা আর কল্যাণী তুজন তুজনের দিকে ধারালো দৃষ্টিতে তাকালো।

কেতকীকে দেখলাম জানলার বাইরে কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপর দেখি সুজাতার সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে অতনু দরজা ঠেলে বেরিয়ে চলে গেল।

অতনু মজুমদারের সঙ্গে আমার তারপরে নিশ্চয়ই আরও কয়েক-বার দেখা হয়েছিলো, কফি হাউসে, কলেজ স্ট্রীটে, মাসিক পত্রিকার অফিসে, অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্-এর প্রদর্শনীতে, এখানে ওখানে সেখানে। কিন্তু সেসব দিনের কথা পরিষ্কার মনে নেই, কারণ সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। ভাসাভাসা শুধু এটুকু মনে আছে যে, প্রত্যেক জায়গায় অতনু এসে কথার তুফান তুলে সবাইকে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে।

আমার সঙ্গেও তার একটা হৃদ্যতা হয়ে গেল, তবে কোথায়, কিভাবে, সেসব পরিষ্কার মনে নেই। হয়তো কফি হাউসে একদিন একা বসেছিলাম, এমন সময় অতনু এলো। সেও একা ছিলো। সুতরাং আমার সঙ্গে বসেই কফি খেলো, গল্প করলো। কিংবা হয়তো দেখা হয়েছিলো কোনো মাসিক পত্রিকার অফিসে, আর সে নিজের থেকেই বললো—তুমি যে লেখো তা তো জানতাম না। তোমার অমুক লেখাটা পড়লাম। বেশ লেগেছে।—তখন নতুন লিখছি। একটা দুটো গল্প এখানে সেখানে বেরোচ্ছে। কেউ একটু ভালো বললেই বিগলিত হতাম। সুতরাং অতনুর ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম।

কিংবা হয়তো অন্য কোথাও দেখা হয়েছিলো, তারপর কি ভাবে জমে গেলাম, সেকথা আজ আর ঠিক মনে নেই।

আজ যখন অতনুর কথা ভাবতে বসি, মনে পড়ে যায় তপতীদের বাড়িতে অতনুর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিন। মনে পড়ে তার ফুল সাজানো, তার আঁকা তপতীর স্কেচ। মনে পড়ে যায়, কেতকী

তার পাশে এসে আস্তে আস্তে বললো, একদিন আপনার ছবি দেখতে যাবো। পরে কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল বলেই এবং অনেক বছর পরে কেতকীর জীবনের শেষ কটা দিন খুব ছুঃখে কাটলো বলেই হয়তো ওই কটা কথা খুব পরিষ্কার মনে পড়ে। তা নইলে ওই সামান্য তিনটে কথা—একদিন আপনার ছবি দেখতে যাবো—মনেই থাকতো না। কবে ভুলে যেতাম।

সেদিন অনেক বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিলো অতনুকে সুজাতার আমন্ত্রণ। কারণ ছু-চারদিন পরেই শুনেছিলাম কল্যাণীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছে।

অতনু গিয়েছিলো সুজাতার বাড়ি। হয়তো প্রায়ই যেতো। তা নিয়ে নিশ্চয়ই কিছু কথাও উঠেছিলো। অত কথা আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে কল্যাণীর ভাই অমিতাভ, যে আমাদের খুব বন্ধু ছিলো সে সময়, একদিন বলেছিলো, আর্টিস্টদের কোনো মনের শৃঙ্খলা নেই। কেন বলেছিলো সেটা তখন বুঝি নি। বুঝেছিলাম অনেক পরে।

অতনুর সঙ্গে যদ্দিন আলাপ হয়নি, তদ্দিন ওর নাম শুনিনি কোথাও। যেমন ওর সঙ্গে আলাপ হোলো, তখন দেখি ও বেশ নামকরা আর্টিস্ট। যারা চিত্রকলার খোঁজ খবর রাখে, তারা সবাই ওকে চেনে। কিন্তু সাধারণ লোকে ওর নাম শোনেনি, কারো সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বলে দিতে হয়,—ইনি একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট, নিশ্চয়ই এঁর নাম শুনেছেন। যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয় সে হয়তো তার পিতৃদেবের জন্মে অতনুর নাম শোনেনি, তবু ভদ্রতা করে বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনেছি, এই তো সেদিনও বসুমতী না দেশ কোথায় যেন আপনার ছবি দেখলাম।"

আস্তে আস্তে লক্ষ্য করলাম যে, আধুনিক চিত্রকলার উপর যেসব প্রবন্ধ এখানে সেখানে বেরোয় তার মধ্যে আর দশজনের সঙ্গে অতনুরও নাম থাকে। সমাজের উপরতলার এক শ্রেণীর যে-

সব মহিলারা চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় ঘনীভূত করে নিজেদের সংস্কৃতিবান মনে করে ধন্যবোধ করেন, তাঁদেরও কয়েকজনের সঙ্গে অতনুকে দেখা যায় চৌরঙ্গি অঞ্চলের বিভিন্ন রেস্তরাঁয়। বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাসের ককটেল্ পার্টিতে অতনুর আমন্ত্রণ আসে, বিদেশী চিত্ররসিকেরা কলকাতায় এসে অতনুর স্টুডিওতে বেড়াতে যায়,—এসব নানারকম অনেক কিছু।

স্নুতরাং অতনুর ছবি দেখবার আগেই জেনে নিলাম যে, অতনু মজুমদার খুব বড়ো আর্টিস্ট।

আরেকজনের সঙ্গে এ সময় আমার খুব অন্তরঙ্গতা হোলো। সে স্নুজাতাদি। এমনি সাধারণ একটা পরিচয় অনেকদিন থেকে ছিলো, কিন্তু অন্তরঙ্গতা হোলো ঠিক এ সময়ে। অতনুর সঙ্গে কি ভাবে আস্তে আস্তে অন্তরঙ্গতা হোলো সেকথা ভালো মনে নেই, কিন্তু কি ভাবে খুব ভাব হয়ে গেল স্নুজাতাদির সঙ্গে, সেটা পরিষ্কার মনে আছে।

আমার নিকট-পরিচিতদের মধ্যে দু-তিনজন আর্টিস্ট এবং কয়েকজন চিত্ররসিক ছিলো বলে মাঝে মাঝে কফি হাউসে কি বসন্ত-কেবিনে আর দশরকম এলোমেলো তথাকথিত ইণ্টালেক্‌চুয়্যাল আলোচনার মত ভারতীয় চিত্রকলা নিয়ে নানারকম কথাবার্তা শুনতাম। অথচ নিজে কিছুই জানতাম না বলে তাতে যোগ দিতে পারতাম না। সেটা খারাপ লাগতো। তাই কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম এ নিয়ে একটু পড়াশুনো করবো,—বেশী নয়, যতোটুকু জানলে অনেক জানি এরকম একটা ধারণা আর দশজনকে করিয়ে দেওয়া যায় ভাসা-ভাসা আধো-দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলে, ঠিক ততোটুকু। কিন্তু কিভাবে শুরু করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

তপতীদের বাড়িতে সেই জন্মদিনের মজলিসের কয়েকদিন পরের

কথা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের নিচে একটি বইয়ের স্টলে ভারতীয় চিত্র-কলার উপর একটি ভালো বই দেখতে পেয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছি। এমন সময় দেখলাম সুজাতাদি ফুটপাত ধরে হেঁটে আসছে।

আমায় দেখতে পেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস করলো, "কি বই এটা ? ও, স্টেলা ক্রামরিশের বই ? এটা আছে আমার কাছে। এসবে তোমার আগ্রহ আছে নাকি ?"

আমি একটু হাসলাম, বললাম, ''না, তেমন কিছু নয়। এমনি একটু উল্টে-পাল্টে দেখলাম। এ বিষয়ে কিছুই তো জানি না।"

"বইটা কিনছো নাকি ?"

"না। অনেক দাম।"

"তুমি যদি এরকম বই পড়তে চাও", সুজাতাদি বললো, "আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারো। অনেক বই আছে আমার কাছে। আনন্দ কুমারস্বামীর একটা ভালো বই আছে। ও বইটা দিয়ে শুরু করতে পারো।"

আমি খুশি হলাম। বললাম, "বেশ তো, একদিন গিয়ে নিয়ে আসবো। কবে যাবো বলো।"

"এখনই চলো না। আমি তো বাড়িই ফিরছি।"

"এখনই !" আমি একটু ইতস্তত করলাম। কিন্তু সুজাতাদি শুনলো না।

হরিশ মুখার্জী রোডে সুজাতাদির বাড়ি। ওর সঙ্গে বাসে চাপলাম। বাসে সুজাতাদি জিজ্ঞেস করলো, "অজন্তার ছবি দেখেছো ?"

"মাসিক পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখেছি।"

সে সময় অজন্তার ছবি এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিলো না। ইউনেস্কো এবং ভারত সরকারের প্রকাশিত অ্যালবামগুলো বেশ সস্তা হওয়ার দরুণ অজন্তার ছবি এখন সাধারণের হাতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সে সময় নিজাম সরকারের তরফ থেকে প্রকাশিত

দুটো না তিনটে অ্যালবাম ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিলো না।
লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রকাশিত ছবির ভল্যুম দুটি বড় একটা
পাওয়া যেতো না। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ও চীনা ভবনে
নন্দলাল বসুর আঁকা কিছু নকল ছিল। হয়ত মুকুল দে-র আঁকা নকল-
গুলিও ছিল, ঠিক মনে নেই। অজন্তার ছবি সম্বন্ধে কৌতুহল তৃপ্ত করতে
হোতো বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা ভারী ভারী বইগুলোর আর্টপ্লেট দেখে।

সুজাতাদি বলল "একজন ইতালিয়ান আর্টিস্ট অজন্তায় গিয়েছিলো
ছবির নকল আঁকতে। সে চারটে ছবি বাবাকে উপহার দিয়েছে।
চলো তোমায় সেগুলি দেখাবো।"

ছবিগুলো টাঙানো ছিলো সুজাতাদিদের বসবার ঘরে। একটি
ছবি,—বুদ্ধের প্রত্যাবর্তন। যশোধারা এবং রাহুলের সামনে ভিক্ষা-
পাত্র হাতে ভগবান বুদ্ধের দীর্ঘ দেহ। মাথার চারদিকে জ্যোতির্বলয়,
মাথার উপরে ছত্রধারণ করে আছে একজন অপ্সরা।

"এটা সতেরো নম্বর গুহার ছবি," বললো সুজাতাদি। ওই
একটি কথায় বুঝিয়ে দিতে চাইলো যে, সে অজন্তার ছবি সম্বন্ধে খুব
ওয়াকিবহাল।

আমি একটু হাসলাম। তারপর অন্য ছবিগুলিও দেখলাম। যদ্দূর
মনে পড়ে, একটি বোধহয় চারজন উড়ন্ত অপ্সরা ও গন্ধর্বের ছবি,
যার মধ্যে একজন অপ্সরার মাথায় রত্নখচিত শিরোভূষণ, যার ছবি
আজকাল একক ভাবে অনেক দেখা যায় পিক্‌চার-পোস্টকার্ডে, আর
বিভিন্ন সাইজের অ্যালবামে।

"এই ছবি সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীতে আঁকা।" সুজাতা আবার
জানিয়ে দিতে চাইলো যে সে কতো জানে আর দশজন ওয়াকিবহাল
চিত্ররসিকের মতো।

অন্য ছবি দুটোর একটি মুমূর্ষু রাজকন্যার, অন্যটি বোধিসত্ত্ব
অবলোকিতেশ্বর পদ্মপানির।

"এটি এক নম্বর গুহার। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে আঁকা," সুজাতাদি বললো।

ছবিগুলোর ভূগোল এবং ইতিহাস সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ ছিলো না। আমি শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখলাম। এর আগে অজন্তার ছবি যা দেখেছি সে শুধু বই বা মাসিক পত্রের আর্ট-প্লেটে। এখন বড়ো ছবিতে রং আর রেখার সূক্ষ্ম কাজ এবং বর্ণ-বিন্যাসের কমনীয়তা দেখে ভাবছিলাম, ছবির নকলই যদি এত সুন্দর, না জানি আসল ছবিগুলো কতো অপরূপ।

সুজাতাদি চা তৈরী করতে করতে শুরু করলো অজন্তা গুহার আবিস্কারের গল্প। হিউয়েন-সাং সেই যে সপ্তম শতাব্দীতে এদেশে বেড়াতে এসে উল্লেখ করেছিলো অজন্তার কথা, তারপর বহুদিন আর কোনো খবর নেই। আউরংজেবের সৈন্যেরা একবার এখানে বিশ্রাম করে যায় দিল্লি ফেরার পথে। কিন্তু সে আউরংজেবের আমল, এ সবে কারো আগ্রহ নেই। আমাদের বরাত ভালো যে ওরা কিছু নষ্ট করে দিয়ে যায় নি। ১৮০৩ সালে লর্ড ওয়েলেসলির কিছু সৈন্য গুহায় ঢুকে রান্নাবান্না করে চলে গেল। তারপর ১৮১৯ সালে এক ইংরেজ সামরিক অফিসার বাঘ শিকার করতে এসে কি ভাবে গুহা-গুলো আবিষ্কার করলো, সে সব গল্প করতে করতে সুজাতাদি হঠাৎ থেমে গেল।

তারপর একটা অদ্ভুত হাসি হেসে বললো, "আমাদের দেশের ছবির গল্প তোমায় শুনিয়ে তো কোনো লাভ নেই। তোমরা সবাই তো অতনুবাবুর ছবির ভক্ত।"

আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, "অতনুবাবুর একটি ছবিও আমি দেখিনি এখন পর্যন্ত।"

সুজাতাদি অন্যদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলো। জিজ্ঞেস করলো, "ছবি না হয় দেখনি। এমনি দেখা হয়েছে তো!"

"হ্যাঁ, তা দু-একবার হয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?"

"এসেছিলো একদিন," সুজাতাদি উত্তর দিলো, "পাঁচ মিনিটও বসেনি। বললো, আসবো বলেছিলাম বলেই এলাম। কাজ আছে বলে চলে গেল।"

"আরেকদিন আসবে নিশ্চয়ই," আমি বললাম, "দেখা হলে বলে দেব।"

"কিছু দরকার নেই," সুজাতাদি বলে উঠলো, "আমি কাউকে সাধতে পারবো না। ওর কাল আসবার কথা ছিলো। চা খেতে বলেছিলাম। আসবে বলে কথাও দিয়েছিলো। আমি ওর জন্যে বসে বসে সারাটা সন্ধ্যে নষ্ট করলাম।"

মনের উত্তাপ ঢাকতে পারলোনা সুজাতাদি। আমার বেশ মজা লাগলো। সুজাতাদি দেখতে সুন্দর, নামকরা ঘরের মেয়ে, ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার আগ্রহ অনেকেরই। সুজাতাদি ঘরে বাইরে চিরকাল হুকুম জারি করে এসেছে, অন্য সবাই তার জন্য অপেক্ষা করেছে, সে কোনোদিন কারো জন্য অপেক্ষা করেনি।

সুজাতাদি মাকে হারিয়েছে খুব অল্প বয়েসেই। ছেলেবেলা থেকেই বাবার কাছে মানুষ। এমনি খুব জেদী, কিন্তু বেশী আদর পেলেও স্বভাবটা নষ্ট হয়নি। লেখাপড়ায় খুব ভালো। আই-এ'তে প্রথম পনেরোজনের মধ্যে ছিলো, বি-এ অনার্সে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে, খুব পড়াশুনো করে, জ্ঞান বুদ্ধি এবং মেধার বিচারে কাউকেই নিজের সমান বলে গণ্য করে না।

আই-এ পাশ করবার পর থেকেই ওর পাত্রের সন্ধান চলছিলো, কিন্তু একজন একজন করে সবাইকেই বাতিল করে দিলো সুজাতাদি।

"শোনো, ওকে তুমি আর কিছু বোলো না," সুজাতাদি বললো, "দেখা হলে কথায় কথায় কথায় জানিয়ে দিও যে ওর ব্যবহারে

আমি একটুও খুশি হইনি। কাউকে কথা দিয়ে কথা না রাখা খুব অন্যায়।”

সুজাতাদি আমায় ছুটো বই বার করে দিলো—ভারতীয় ললিত-কলার উপর হাইনরিখ জিমারের বিখ্যাত বইয়ের ছুটো খণ্ড। চা খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে আমি চলে আসছিলাম, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত হোলো অতনু মজুমদার।

“তুই!” আমায় দেখে বলে উঠলো অতনু, “ভালোই হোলো।”

কেন ভালো হোলো বুঝতে পারলাম না, তবে আমায় দেখে অতনুর চোখে মুখে যে পুলকের সঞ্চার হোলো তার মধ্যে যে কোনো ভেজাল নেই সেটা অনুভব করলাম। বেশ বুঝলাম যে অতনু আমার সঙ্গ ছাড়তে রাজী নয়।

সেকথা সুজাতাদিও বুঝলো। সুতরাং আমি যখন উঠে পড়বার সংকল্প ঘোষণা করলাম, অতনুর চাইতে অনেক বেশী আন্তরিকতা দেখিয়ে আমায় বসিয়ে রাখলো সুজাতাদি।

চায়ের কাপ মুখের কাছে তুলতে যাবে, এমন সময় অতনুর চোখ পড়লো ঘরের দেওয়ালে অজন্তার মুমূর্ষু রাজকন্যার ছবির নকলের উপর। অতনু চায়ের কাপ রেখে ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো, তারপর এসে চেয়ারে বসে পড়লো।

“আপনার অজন্তার ছবি ভালো লাগে?” জিজ্ঞেস করলো সুজাতা।

অতনু অবাক হয়ে সুজাতার দিকে তাকালো। তারপর একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, “আপনার পদ্মফুল ভালো লাগে? রামধনুর রং ভালো লাগে? পূর্ণিমার চাঁদ ভালো লাগে?”

সুজাতাদি কথার শ্লেষ অনুধাবন করলো, আরক্ত হোলো তার কান ছুটো। আস্তে আস্তে বললো, “আপনারা মডার্ন আর্টের ভক্ত। অজন্তার ছবি আপনাদের ভালো লাগবার তো কথা নয়।”

"আমরা মডার্ন আর্টের অনুরাগী বলেই আমাদের দেশের প্রাচীন চিত্রকলা আমাদের ভালো লাগে," উত্তর দিলো অতনু, "মডার্ন আর্ট বুঝতে না পারলে ইউরোপীয় রেনেসাঁস আর্টই বলুন আর প্রাচীন ভারতের শিল্পকলাই বলুন, কোনোটাই যে ভাবে বোঝা উচিত সে ভাবে বোঝা সম্ভব নয়।"

"কেন ?" সুজাতাদি যেন মনে মনে আস্তিন গুটালো।

"অজন্তার যুগে অজন্তার চিত্রকলার শিল্পরীতিই ছিলো তৎকালীন আধুনিকতম শিল্পরীতি। শিল্পকলায় আধুনিকতার মৌলিক উপাদান হোলো তার বাস্তবধর্ম। এই বাস্তবতা এক যুগ থেকে আরেক যুগে বদলে-বদলে যায়। বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতা আর সপ্তম শতাব্দীর বাস্তবতা এক জিনিস নয়। তাই এক যুগের শিল্পরীতি আরেক যুগে অচল। অজন্তার ছবির মত এত বাস্তবধর্মী শিল্পসৃষ্টি অন্য দেশে বা অন্য যুগে খুব কমই হয়েছে। বলেছে জাতকের গল্প, কিন্তু এঁকেছে সমসাময়িক সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের হাসি, তাদের কান্না, তাদের দুঃখ, তাদের আনন্দ। এঁকেছে বুদ্ধের ছবি, কিন্তু ফুটিয়ে তুলেছে বিবর্তনশীল মানবসভ্যতার অন্তর্জীবনের চির-আকাঙ্খিত শান্ত সমাহিত রূপ। সেই যুগের শিল্পী সে যুগের মানুষের মনের আয়নায় আজকের মানুষের মনকে ধরেছে ; আর তাই সে কালজয়ী হয়ে গেছে। এই হোলো শিল্পকলার আধুনিকতার পরম আদর্শ।"

"আপনি বলছেন মানব জীবনের বাস্তবতা এক যুগ থেকে আরেক যুগে বদলে যায়। কিন্তু জীবনের পরম সত্যগুলো তো চিরন্তন।"

"অস্বীকার করছি না, কিন্তু বলুন, বাস্তব-বিমুখ হয়ে কি সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যায় ?"

সুজাতাদি একটু বাঁকা হাসি হাসলো, "আপনি বললেন, অজন্তার ছবি বাস্তবধর্মী। আমার মনে হয় শুধু একথা বললে অজন্তা যুগের শিল্পসৃষ্টিকে খুব ছোটো করে দেখা হয়। অজন্তার ছবির মূল সুর হোলো আধ্যাত্মিক।"

"সেকথা কেউ অস্বীকার করবে না, কিন্তু তাতে তার বাস্তবধর্মী হতে বাধা কি?"

খুব জোরে ঘাড় নাড়লো সুজাতাদি। বলে উঠলো, "অজন্তার ছবির আসল জিনিসটা হোলো তার আদর্শবাদ। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী এবং বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা চিত্রিত করে দেখাতে চেয়েছে এই বস্তুতান্ত্রিক জীবনের নশ্বরতা এবং অনিত্যতা, আর প্রচার করতে চেয়েছে বুদ্ধের অহিংসার বাণী।"

অতনু খুব জোরে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, "আপনার মুণ্ডু।"

অতনুর ভাষা শুনে সুজাতাদি স্তম্ভিত হলো। আমার হাসি পাচ্ছিলো। দেখলাম সুজাতার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

সেদিনের সন্ধ্যা ওরা তর্ক করে কাটালো।

সুজাতাদির বক্তব্য ছিল ভারতীয় শিল্পী পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিল্পীর মত নয়। সে শুধু ছবি আঁকবার জন্যে ছবি আঁকে না। ভারতীয় শিল্পকলার প্রেরণা হলো আধ্যাত্মিক, ভারতের জীবন-দর্শনকে সে ফুটিয়ে তুলতে চায় শিল্পসৃষ্টির মধ্যে, উপলব্ধি করতে চায় পরম সত্য এবং পরম জ্ঞানকে, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের যে মর্মবাণী—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—তাকে প্রকাশ করতে চায়।

অতনু চুপচাপ কিছুক্ষণ শুনলো সুজাতাদির উচ্ছ্বাস। তারপর সুজাতাদিকে কোনো কথা আর বলতে দিলো না। নিজেই একটানা বলে গেল।

আমি এখানে বিতর্ক-সভার রিপোর্ট দিতে বসিনি। সেদিন আমার সত্যিই একঘেয়ে লাগছিলো। তবু অতনু সেদিন যে কথা সুজাতাদিকে বোঝাতে চেয়েছিলো, সেটা মোটামুটিভাবে একবার এখানে বলে নিতে চাই এজন্যে যে, তার এই বক্তব্যের জন্যেই সেদিন আমরা তাকে খানিকটা বুঝতে পেরেছিলাম, এবং তারপর আমি আর

সুজাতাদি কোনোদিন অতনুকে ভুল বুঝিনি তার বিভিন্ন সময়ের নানারকম আপাতদুর্বোধ্য আচরণের জন্যে। তাকে নিয়ে অনুযোগ করেছি, তার উপর রাগ করেছি, তার ব্যবহার বা আচরণ সমর্থন করিনি, কিন্তু কোনোদিন ভুল বুঝিনি তাকে। তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তার এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অবলোকন করেছি বলেই তার সমস্ত সামাজিক বা ব্যাবহারিক ভুলভ্রান্তি অবহেলা করে গেছি।

অতনু বলেছিলো, সমকালীন ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় জীবন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, সুতরাং ভারতীয় শিল্পকলার বিষয়বস্তু ধর্মবিষয়ক। তবু যে কোনো শিল্পসৃষ্টিতে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যে প্রয়োজন শিল্পীর গভীর জীবনবোধ, জীবন সম্বন্ধে একান্ত আগ্রহ এবং অপরিসীম বিস্ময়। একথা সত্যি যে, ভারতীয় জীবনের মূল সুর হোলো তার ধর্মপ্রাণতা। ভারতীয় শিল্পীর জীবনবোধ একটা আধ্যাত্মিক মূল্যমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের যেই আধ্যাত্মিক মূল্যমান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে আজ পর্যন্ত, সেই মূল্যমান ভারতের শিল্পসৃষ্টিকেও রেখেছে কালজয়ী করে।

তবু—সবার উপরে মানুষ সত্য। ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ-মন-ধ্যানের অন্তর্জগতে জীবনবল্লভ যে পরমপরমেশ্বর, শিল্পীর জীবনে পূর্ণবিকশিত রূপে তিনি হলেন নরনারায়ণ। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবনের মহৎ সুন্দর রূপকে ভারতীয় শিল্পী কোনোদিন অস্বীকার করে না। যে শিল্পী কয়েক শতাব্দী ধরে অজন্তা গুহার শিল্পকলা সৃষ্টি করেছে, সে লোক-চক্ষুর অন্তরালে, দুর্গম অরণ্যে, পর্বতকন্দরে তার শিল্পসাধনা করলেও সে বাণপ্রস্থধর্মী নয়, সে ইন্দ্রিয়নিরাসক্ত সন্ন্যাসী হলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ রস গন্ধের ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য কালাতীত করে প্রকাশ করবার জন্যে তার ব্যাকুল আগ্রহ। সে ইন্দ্রিয়জয়ী, কিন্তু ইন্দ্রিয়বিমুখ নয়। ইন্দ্রিয়বিমুখ হলে কেউ শিল্পী হতে পারে

না। তাই অজন্তা গুহায় শিল্পসৃষ্টি করেছে যে সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু, সে তার কাজ করে গেছে বুদ্ধং-স্মরণং-গচ্ছামি জপ করতে করতে—তবু সারা বিশ্বের সৌন্দর্য, বিস্ময়, জীবনের তীব্রতা, উত্তেজনা, আবেগ সঞ্চারিত হয়ে আছে তার সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্যে।

আর এখানেই তাদের সঙ্গে মডার্নিস্ট শিল্পীদের সবচেয়ে বড় মিল—বললো অতনু। যে আমাদের ছবি বোঝে, সে তাদের ছবিও ঠিকমতো বোঝে। যে আমাদের ছবি বোঝে না, সে তাদের ছবিতে অহিংসা-পরম-ধর্ম ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। যে আধুনিক চিত্রকলার আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারে না, সে কি করে বুঝবে ভারতীয় চারুশিল্পের ষড়ঙ্গের প্রয়োগ কতখানি সার্থকতা ও সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে অজন্তার ছবিতে। যেমনটি দেখছি, ঠিক তেমনটিই আঁকতে হবে—এই ভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে ইউরোপীয় শিল্পীর পাঁচশো বছর লেগেছে। কিন্তু আমাদের চারুশিল্পের ছয়টি অঙ্গ—রূপভেদ, প্রমাণম, ভাব, লাবণ্যযোজনম, সাদৃশ্যম এবং বর্ণিকাভঙ্গ—ভারতীয় চিত্রকলাকে চোখের চেনার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে মনের চেনার সন্ধান দিয়েছে।

আর এই মনের চেনাই হলো আজকালকার অ্যাব্স্ট্রাক্ট ছবির প্রেরণা।

"সুতরাং", অতনু বললো সুজাতাকে, "তুমি যদি আমায় চিনতে চাও, আগে আমার ছবি চেনো। যদি আমায় ভালবাসতে চাও, আমার আর্টকে ভালবাসো।"

আমি অবাক হয়ে অতনুর দিকে তাকালাম, সুজাতাদির দিকে তাকালাম। দেখলাম সুজাতাদি একটু যেন শিউরে উঠলো।

সুজাতাদি সুন্দর কিন্তু চিরকালই তার চোখমুখ একটু রুক্ষ। দেখলাম, এখন সেই রুক্ষতা মুছে গিয়ে যেন একটা অভূতপূর্ব কমনীয়তা ফুটে উঠেছে তার মুখে।

আমার দিকে ফিরে অতনু বললো, "তুই এবার বাড়ি যা। তোকে আমার বা সুজাতার, কারো দরকার নেই।"

"কেন, ও থাক না, তোমরা একসঙ্গে যাবে," অস্ফুট দ্বিধাবিজড়িত কণ্ঠে বললো সুজাতাদি।

কখন ওরা হঠাৎ আপনি থেকে তুমির পর্যায়ে নেমে এসেছে ওরা নিজেরাই হয়তো খেয়াল করে নি। আমি খুব অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম।

"না", অতনু উত্তর দিলো, "আমি জানি যে তুমি আমায় কিছুক্ষণ একলা চাও।"

"কে বললে ?" ধরা গলায় বললো সুজাতাদি।

"চোখের জল যে আজ তুদিন ধরে জমা হয়ে আছে, সে-সব ঝরিয়ে দিতে হবে তো !"

সুজাতাদি হঠাৎ আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো।

"আমি এবার যাই," আমি বললাম।

"হ্যাঁ, তুই বাড়ি যা," বললো অতনু।

জানি না কেন—একটু রাগ হয়েছিলো সুজাতাদির উপরে। এসব কী ছেলেমানুষি !

কিন্তু তারপরদিন সকালবেলা এসে উপস্থিত হোলো সুজাতাদির চাকর, বললে,—দিদিমণি ডেকে পাঠিয়েছেন, বিশেষ দরকার। সঙ্গে সঙ্গে পায়জামার উপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে উপস্থিত হলাম সুজাতাদির বাড়ি।

প্রথম কথাটাই সুজাতাদি বললো, "তোমাদের অতনু মজুমদার একটা জানোয়ার।" বলতে বলতে সুজাতাদির চোখে জল এসে গেল।

আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। অতনু যাই হোক, সুজাতাদিও কচি খুকি নয়। আর, এসব ওদের নিজেদের ব্যাপার। আমি কেন তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাই !

আমি চুপচাপ দেয়ালে টাঙানো একটি ছবি দেখছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "ওটা কার আঁকা ?"

সুজাতাদি দিল্লির একজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম করলো। বললে, "ওটা কামোদ রাগের ছবি। একটি শ্লোকের বর্ণনা অনুসরণ করে রাজপুত রীতিতে আঁকা।" তারপর একটু থেমে অনুরোধ করলো, "পরিমল, তোমায় আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।"

"কি কাজ ?"

একটা বইয়ের ভেতর থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বার করলো সুজাতাদি। বললো, "এটা অতনুর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আর—একথা কাউকে বলবে না কিন্তু।"

একটু না হেসে পারলাম না। বললাম, "অনেক ছেলেবেলায় হাসিদি, শোভাদি, খুকিদি, অমুকদি, তমুকদির জন্যে এসব অনেক করেছি। তখন অতো বুঝতাম না। একটু রোমাঞ্চও লাগতো। এখন আর এসবের মধ্যে আমাকে জড়ানো কেন ?"

সুজাতাদির চোখ দুটো খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। বললো, "তুমি চিঠিটা পড়ে দেখতে পারো।"

আমি জানালাম যে চিঠি পড়বার আগ্রহ আমার বিন্দুমাত্রও নেই।

সুজাতাদি বললো, "দেখ, এ চিঠি ওর কাছে আজ পৌঁছাতেই হবে। কিন্তু আমি তো আর কাউকে পাচ্ছি না যাকে দিয়ে এটা পাঠানো যায়।"

ওর চোখে একটা ব্যাকুল মিনতি ছিলো। তাই রাজী হলাম। তবে একথাও জানিয়ে দিলাম যে, চিঠি নিয়ে যাচ্ছি এই একবারের মতই। আর পারবো না।

চিঠি পড়ে অতনু খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো, "মেয়েটার মাথা খারাপ। কি লিখেছে জানিস ? লিখেছে, তুমি আর এসো না। যদি আসো তো আমার দেখা পাবে না।"

শুনে আমার খুব রাগ হোলো সুজাতাদির উপর। এ তো অতনুকে আবার যাওয়ার জন্যে আহ্বান! কিন্তু ওরা যা করবে করুক, আমায় কেন দূত হিসেবে ব্যবহার করা? সুজাতাদির সঙ্গে আমার তেমন কিছু অন্তরঙ্গতা নেই। অতনুর সঙ্গেও দু-চারদিন কফি হাউসে আড্ডা দিয়েছি, এই পর্যন্ত। আমায় কেন?

এ প্রশ্নের একটা উত্তর আমি অতনুর কাছেই পেয়েছিলাম কয়েকদিন পরে। আমি সুজাতাদির অন্তরঙ্গও নই, অতনুরও নই। কিন্তু ঘটনাচক্রে ওদিন সন্ধ্যেবেলা আমি উপস্থিত ছিলাম সুজাতাদির বাড়ি। শুধু আমিই বুঝতে পেরেছিলাম ওদের নতুন সম্পর্ক। সুতরাং আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে সুজাতাদির আমায় অন্তরঙ্গ করে নেওয়ার প্রয়োজন ছিলো।

হয়তো তাই। আমি কিন্তু অতনুর এই উত্তর পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি। আমার সংশয় ঘুচে গিয়েছিলো আরো অনেক পরে।

তদ্দিনে আমি আরো মেলামেশা করে সুজাতাদির একটু অন্তরঙ্গই হয়ে উঠেছি। আমি আর্টের কিছুই বুঝি না। দেখলাম, সুজাতাদি উঠে পড়ে লেগেছে আমায় চিত্রকলার রসে অনুরক্ত করবার জন্যে। এ-বই সে-বই পড়তে দিচ্ছে, নানারকম অ্যালবাম দেখাচ্ছে, রাজপুত চিত্রকলা, মোগল চিত্রকলা, কাংরা চিত্রকলা খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এমনি করে বেশ ভালো লাগতে লাগলো সুজাতাদির সঙ্গ। একদিন দেখলাম, বড্ড জড়িয়ে পড়েছি সুজাতাদির সঙ্গে। মার্কেটে যেতে হলে আমায় ছাড়া ওর চলে না, সিনেমায় যাওয়ার সময় আমার জন্যেও টিকিট কেনে, বাড়িতে ডেকে নিয়ে খাওয়ায়, প্রায় বিকেলে চা খাওয়াতে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রীটে, লিণ্ডসে স্ট্রীটে। ওর বন্ধু-বান্ধবীদের বাড়ি আমাকেও নিয়ে যায় সঙ্গে করে।

চেনাশোনারা সবাই আমাদের প্রায় সময়ই একসঙ্গে দেখতে লাগলো এখানে সেখানে। সুজাতাদির কুশল সংবাদ সবাই আমাকেই

জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো। আমায় সমীহ করতে শুরু করলো স্নুজাতাদির অনুরক্তেরা।

প্রথম ধাক্কা খেলাম একদিন স্নুজাতাদির এক বন্ধুর প্রশ্ন শুনে। তার নাম, যদ্দূর মনে পড়ে, অনিমা। বেড়াতে গিয়েছিলাম কল্যাণীদির ওখানে। সেখানে ছিলো অনিমাদিও। সে হঠাৎ ভালোমানুষের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা ভাই, স্নুজাতাদি তোমার ক'বছরের বড়ো?"

"বছর দুই-তিন হবে," আমি বললাম সহজ ভাবে, "কেন?"

"না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

আরো দু-একজন ছিলো সেখানে। ওরা যেন মুখ টিপে একটু হাসলো।

ওদের মনের ভিতর কি আছে, সে কথা আমি যে আঁচ করতে পারলাম না তা নয়। খুব চটে গেলাম মনে মনে, যদিও চেষ্টা করলাম মুখে একটা সহজ সরল ভাব ফোটানোর।

কল্যাণীদি হঠাৎ স্নুজাতাদির খুব প্রশংসা করতে শুরু করলো। সেই চিরন্তন মামুলী মেয়েলী প্রশংসা,—স্নুজাতার মতো ভালো মেয়ে হয় না, ওর মতো মিষ্টি স্বভাব খুব কম দেখা যায়, ওরকম স্কলার বেশী পাওয়া যায় না,······এই সব।

শুনে আমি হাসলাম মনে মনে।

স্নুজাতাদি আর কল্যাণীদি খুব বন্ধু। কিন্তু দুজনের স্বভাব একেবারে উল্টো। স্নুজাতাদির চেহারা স্নুন্দর, ফর্সা গায়ের রং, তবু খুব ছেলে-ছেলে দেখতে, চলায় ফেরায় কথায় বার্তায় একটা পুরুষালী ভাব আছে। কল্যাণীদি দেখতে ভালো নয়, গায়ের রং শ্যামলা, কিন্তু বড়ো বেশী মেয়েলী। স্নুজাতাদির ভারী গড়ন, লম্বা চওড়া দেখতে। কল্যাণীদি ছোটো-খাটো ছিমছাম। স্নুজাতাদির কথাবার্তায় চলা-ফেরায় একটা তেজ আছে, কিন্তু কোনোরকম দেমাক নেই।

কল্যাণীদি বড্ড মিনমিনে, খুব নম্র, কিন্তু তার মনে মনে একটা চাপা আত্ম-সচেতন দম্ভ, সব সময় যেন সজাগ যে সে জাতে মেয়ে-মানুষ এবং সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন তার আশেপাশের ছেলে-ছোকরারা। সুজাতাদির বাড়ির অবস্থা খুব ভালো। কল্যাণীদি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে,—তবে বাড়ির আবহাওয়া মোটেও পুরাতনপন্থী নয়। সুজাতাদি লেখাপড়ায় খুব ভালো, কল্যাণী আর দশজন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর মতো।

একটি জায়গায় খুব মিল। দু-জনেরই পরিচিত ছেলে অনেক থাকলেও, ছেলেদের থেকে দুজনেই একটু তফাতে থাকে। সুজাতাদি তফাতে থাকে, ছেলেদের সে বুদ্ধিবৃত্তিতে নিজের সমান মনে করে না বলে, এবং হয়তো তাদের সঙ্গ প্রয়োজন বোধ করে না বলে। কল্যাণী তফাতে থাকে, কারণ সে ছেলেদের ভয় পায়।

তাই কলেজ জীবনের প্রথম কয়েক বছর এরা সব সময়ই একসঙ্গে থাকতো, একসঙ্গে চলাফেরা করতো। একজনকে ছাড়া আরেকজনকে কখনো একলা দেখাই যেতো না কোথাও।

কলেজের ছেলেরা তাই এদের নাম দিয়েছিলো—দাদা-বৌদি। এদের অন্তরঙ্গতা নিয়ে নানারকম ঠাট্টা করতো, টীকা-টিপ্পনি করতো।

তবে ইদানিং আর আগের মতো অন্তরঙ্গতা ছিলো না তাদের মধ্যে, বিশেষ করে কল্যাণীদিদের বাড়িতে অতনুর যাওয়া-আসা আগের চাইতে আরো অনেক বেড়ে যাওয়ার পর।

সুজাতাদির বাড়িতে অতনুকে আর কোনোদিন দেখিনি। কোনোদিন ওর মুখে শুনিওনি অতনুর নাম। অতনুও কোনোদিন সুজাতাদির কথা আমায় জিজ্ঞেস করে নি।

কল্যাণীদির বাড়িতে অতনুকে কয়েকবার দেখেছি। যেতো, চা খেতো, আড্ডা দিতো, তারপর চলে যেতো। পথে ঘাটেও যে কল্যাণীদি আর অতনুকে কয়েকবার একসঙ্গে দেখিনি তা নয়। সবাই জানতো যে, কল্যাণীদির সঙ্গে অতনুর বিয়ে হবে। দিন

একটা ঠিক হয়ে ছিলো, তারপর কি একটা পারিবারিক কারণে পিছিয়েও গিয়েছিলো। কবে হবে, সে কথা কেউ তখনো শুনতে পায়নি। এক সময় হলেই হয়,—অতনুর এরকম একটি ভাব। কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস করতো না।

একদিন কল্যাণীদি হঠাৎ আমায় জিজ্ঞেস করলো, "পরিমল, তুমি তো প্রায়ই সুজাতার সঙ্গে থাকো, তাই না?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই থাকি," আমি উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা, অতনু কি মাঝে মাঝে সুজাতার বাড়ি যায়?"

প্রশ্নের ধরন শুনে ভালো লাগলো না। বললাম, একটু গম্ভীর হয়েই, "আমি তো কোনোদিন দেখিনি।"

একটু ইতস্তত করে আবার জিজ্ঞেস করলো কল্যাণী, "ওদের কি বাইরে দেখা হয়?"

আমার রাগ হলো মনে মনে। উত্তর দিলাম, "সে খবর আমি কি করে জানবো বলো। সুজাতাদি তোমার বন্ধু! তাকেই জিজ্ঞেস কোরো।"

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন সুজাতাদির সঙ্গে লাইব্রেরিতে যাবো এরকম কথা ছিলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবো, এমন সময় শুনতে পেলাম কল্যাণীদির খুব উত্তেজিত মিহি কণ্ঠ।

"তোর লজ্জা করে না? ছিঃ।"

সুজাতাদির গলা শুনতে পেলাম, "কি যা তা বলছিস? পরিমল ঠিক আমার ছোটো ভায়ের মতো।"

নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

"সে তো বুঝলাম," শোনা গেল কল্যাণীদির গলা, "কিন্তু ওকে শিখণ্ডীর মতো সামনে খাড়া করে এই ধোঁকাবাজি করার কি দরকার ছিলো? তুই জানতিস অতনুর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে

আছে। আমায় আগে বললি না কেন? কি দরকার ছিলো আমার সঙ্গে এরকম লুকোচুরি করবার? পরিমলকে নিয়ে তুই সব সময় ঘুরে বেড়াস এজন্যে যাতে আমরা মনে করি তুই ওর সঙ্গে ছাড়া আর কারে সঙ্গে মিশিস না, এই তো।"

"পরিমলকে আমি ঠিক আমার ছোটো ভায়ের মতো ভালোবাসি," খুব শান্ত গলায় উত্তর দিলো সুজাতাদি।

"পরিমলের সঙ্গে যাই সম্পর্ক হোক, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি শুধু জানতে চাই, তুই কি করে আমার বন্ধু হয়ে আমাকে লুকিয়ে যার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে তার সঙ্গে—"

কল্যাণীকে কথা শেষ করতে দিল না সুজাতা। বললো, "আমি হলে এসব প্রশ্ন তোকে করতে যেতাম না। যা জানবার, অতনুর কাছে গিয়েই জানতে চাইতাম।"

কল্যাণী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ধরা গলায় বললো, "তুই বড় ঘরের মেয়ে। তুই তো অতনুকে বিয়ে করবি না।"

সুজাতা উত্তর দিলো খুব আস্তে আস্তে, "অতনু যদি আমায় বিয়ে করতে চায় আমি না বলবো না।"

আমি ভাবলাম আমার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। পা টিপে টিপে চলে আসছিলাম, হঠাৎ হোঁচট খেলাম সিঁড়ির কাছে। শব্দ শুনে সুজাতাদি বেরিয়ে এলো। খুব অপ্রস্তুত বোধ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কল্যাণীও বেরিয়ে এলো। একবার তাকালো আমার মুখের দিকে, আরেকবার সুজাতার মুখের দিকে। তারপর বললে, "আচ্ছা, আমি যাই এবার।"

সুজাতাদি ঘাড় নাড়লো।

কল্যাণীদি আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল।

"এসো পরিমল, ভেতরে এসো," মিষ্টি হেসে বললে সুজাতাদি।

ভেতরে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম তুজনেই।

তারপর এক সময় সুজাতাদি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বুঝি জানতে কিছু আর বাকী নেই?"

আমি ঘাড় নাড়লাম, মুখে কিছু বললাম না।

"আমার উপর রাগ হচ্ছে বুঝি?" জিজ্ঞেস করলো সুজাতাদি।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "আমায় আগে বললেই পারতে। আমি তো আর বলতে যেতাম না কাউকে।"

কোথায় যেন কাঁটা বিঁধছিলো আমার মনের ভিতর।

সুজাতাদি হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। কি ছিলো আমার মুখের উপর জানি না। বেদনার ছায়া পড়লো সুজাতাদির মুখে। একটু চুপ করে থেকে বললো, "হ্যাঁ, বললে ভালোই হোতো।"

সেদিন সুজাতাদি একটু একটু করে অনেক কথাই বলেছিলো। শুনে অবাক হয়েছিলাম, স্তম্ভিত হয়েছিলাম। শ্লথগতি মধ্যবিত্ত জীবনে যে মন্থর সীমিত রোমান্সের সঙ্গে পরিচয় আছে, তার থেকে এদেরটা যেন অন্যরকম। তুর্দম, নিষ্ঠুর প্রেম, যা নিতে জানে, কিছু দিতে পারে না। সুজাতাদির মত স্কলার মেয়েকে এরকম একটি ঝোড়ো ভূমিকায় ভাবতে পারা যায় না।

"কল্যাণীদি খুব কষ্ট পাবে," আমি বললাম।

"তু-চার দিন, তারপর ভুলে যাবে।"

বড্ড নির্মম, হৃদয়হীন মনে হোলো সুজাতাদির উত্তর, বললাম, "ভুলে কি আর যাবে? ওর যে মনে আছে, সে কথা কাউকে জানতে দেবে না, এই মাত্র।"

সুজাতাদি কলমে কালি ভরছিলো। এক টুকরো ব্লটিং পেপার দিয়ে কলম পুঁছতে পুঁছতে বললো, "একটুও মনে থাকবে না। অতনুর মতো ছেলের কাছ থেকে কল্যাণীর মতো মেয়ের কিছু পাওয়ার

নেই, ওকে কিছু দেওয়ারও নেই। প্রথম নজরেই আমি বুঝেছিলাম, অতনুর সঙ্গে ওর বিয়ে কোনোদিনই হবে না।"

"কিন্তু অতনু রাজী হয়েছিলো ওকে বিয়ে করতে," আমি বললাম।

হ্যাঁ, অতনু রাজী হয়েছিলো, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ওদের বিয়ে হয়েও যেতো। সুজাতাদি আর অতনুর সম্পর্ক কেউ জানতো না, কল্যাণীদিও জানতে পারতো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন জানতে পারলো। কিছু শুনেছিলাম অতনুর কাছে, কিছু সুজাতাদির কাছে, কিছু কল্যাণীদির ভাই অমিতাভর কাছে। এর কাছে ওর কাছে একটু একটু করে শুনে সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনে রূপ নিয়েছিলো একটা চলতি ছবির মতো।

কল্যাণীদি অতনুর বাড়ি বড়ো একটা যেতো না। যখন ইচ্ছে করতো তার সঙ্গে দেখা করতে, তাকে ডাকিয়ে আনতো নিজের বাড়িতেই। কিন্তু একদিন সকালবেলা এমনি হঠাৎ অতনুর বাড়ি এসে দেখে সে একটি ছবির উপর তুলির শেষ টানগুলো দিচ্ছে।

"কি আঁকছো দেখি ?"

এক মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত মনে হয়েছিলো অতনুকে, কিন্তু সে-ভাব সামলে নিয়ে সে খুব সহজভাবে কল্যাণীকে ছবিটি দেখালো।

"আরে এ তো সুজাতার ছবি !"

"হ্যাঁ !"

কল্যাণী ছবিখানি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো। ছবি আলোকচিত্র নয়। তার নিজের একটা ভাবা আছে। কল্যাণী ছবিটি দেখেই বুঝলো। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমায় বলোনি কেন ?"

"বলার দরকার ছিলো না," নির্বিকার উত্তর দিলো অতনু।

কেঁপে উঠলো কল্যাণীর নিচের ঠোঁট। জিজ্ঞেস করলো, "ওর কী আছে যা আমার নেই ?"

অতনু একটু হেসে বললো, "সংসারে সব মেয়েরই একটা কিছু থাকে যা অন্য কোনো মেয়ের থাকে না।"

"কিন্তু তোমার বিয়ে হবে আমার সঙ্গে, সুজাতার সঙ্গে নয়।"

"সে কথা তো আমি অস্বীকার করি নি।"

"আমায় বিয়ে করতে হলে কিন্তু এসব চলবে না," শাসন করলো কল্যাণী।

অতনু আস্তে আস্তে তুলি রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শান্ত দৃষ্টিতে তাকালো কল্যাণীর দিকে। তারপর বললো, "কল্যাণী তুমি বাড়ি যাও।"

"মানে?" অবাক হয়ে অতনুর দিকে তাকিয়ে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি বাড়ি যাও। আমার কাছে আর এসো না।"

কল্যাণী নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারলো না। এত গভীর প্রশান্ত অবহেলার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে সে ভাবতেও পারে নি। ভেবেছিলো ধরা পড়ে অতনু অপ্রস্তুত হবে, দোষ স্বীকার করে মার্জনা চাইবে, তখন কল্যাণী হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়ে তার সব অপরাধ ক্ষমা করে বিজয় গর্বে মনে মনে হাসবে সুজাতার কথা ভেবে। কিন্তু তা তো হোলো না। অতনুর মুখ থেকে শুনতে হোলো,—তুমি বাড়ি যাও, আমার কাছে আর এসো না।

"কেন তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলে?" চোখের জল চেপে জিজ্ঞেস করলো কল্যাণী।

অতনু কি যেন বললো নিজের মনে। তারপর রং গুলতে গুলতে বললো, "সবাই পীড়াপীড়ি করছিলো বিয়ে করবার জন্যে। ভাবলাম, বিয়ে যদি একটা করতেই হয়, সেই ল্যাঠা এই বেলা সেরে ফেলাই ভালো। আর, আমি যদি বিয়ে করতেই চাই, আমার জন্যে তো কোনো রাজকন্যা বা ডানা-কাটা পরী জুটবে না, তোমারই মতো একজন কেউ জুটবে। সুতরাং তোমায় বিয়ে করলেই বা

ক্ষতি কি। তাই আমায় যখন তোমার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হোলো তোমায় দেখতে, আর দেখলাম তুমি গররাজী নও, তখন রাজী হয়ে গেলাম। তুমি খুব সাধারণ মেয়ে, তোমার সাধারণ চেহারা, সাধারণ বুদ্ধি, সাধারণ রাগ, সাধারণ ভালোবাসা, জীবনের কাছে পাওয়ার প্রত্যাশা খুব সাধারণ, দেবার ক্ষমতাও সাধারণ, তোমার মতো মেয়েরা বৌ হিসেবে খুব ভালো। তাই রাজী হয়েছিলাম। এখন দেখছি, তোমার মতো মেয়েরা বড়ো অফিসারের বৌ হতে পারে, চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট বা ইঞ্জিনিয়ারের বৌ হতে পারে, স্টেশন মাস্টারের বৌ হতে পারে, ডাক্তারের বৌ হতে পারে, —কিন্তু আর্টিস্টের বৌ হতে পারে না। তুমি চাও আমাকে তোমার নিজের পছন্দমতো গড়ে নিয়ে বিয়ে করতে, অথবা আমাকে বিয়ে করে তোমার মনের মতো করে গড়ে নিতে। আমি যা আছি তাকে তুমি অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করতে পারবে না।"

কল্যাণী ততক্ষণে ফুলতে শুরু করেছে। বললো, "দেখ, সোজা কথাটা সোজাসুজি বলো। আমি চাই আমার স্বামী শুধু আমার হবে। সংসারের সব মেয়েই তাই চায়। তুমি যা আছো, তাতে আমার অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ করার অর্থ যদি এই হয় যে, তুমি বিয়ে করবে আমায় এবং বেলেল্লাপনা করে বেড়াবে অন্যের সঙ্গে, এই অবস্থা স্বীকার করে নেওয়া, তাহলে তোমায় আমার দরকার নেই। সে তুমি আর্টিস্টই হও বা ভগবানই হও।"

অতনুর উত্তর শোনার জন্যে আর অপেক্ষা করে নি কল্যাণীদি। উঠে চলে এসেছিলো।

আমি শুনে বলেছিলাম, "কী অন্যায় কথা! অতনু প্রতিভাধর শিল্পী হতে পারে, কিন্তু কল্যাণীদির মতো এত ভালো মেয়ের সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করা ওর উচিত হয় নি।"

অন্য সবাই ওই একই কথাই বলেছিলো।

কিন্তু সুজাতাদি আমার কথা শুনে বললো, "তা নয় কিন্তু, এ-ছাড়া অতনুর উপায় ছিলো না। কল্যাণী যদি ওকে বাঁধতে পারতো, আমি অতনুকে টানতে পারতাম না। তোমরা যে ব্যাপারটা শুনেছো, সেটা শুধু উপলক্ষ। ঘটনা হিসেবে এটা বড়ো, কিন্তু এর বিশেষত্ব খুব সামান্য। আসলে যা হয়েছিলো, সেগুলো ঘটনা হিসেবে কিছুই নয়, কিন্তু তার বিশেষত্ব খুব। ওদের যখন বিয়ের ঠিক হোলো তার পর থেকেই কল্যাণী অতনুর পেছনে লেগেছিলো যাতে সে বিয়ের আগে একটা চাকরি যোগাড় করে নেয়। যে কোনো চাকরি, ছবি আঁকার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাক বা না-ই থাক। খবরের কাগজ খুলে বিজ্ঞাপন দেখতো, নিজে অ্যাপ্লিকেশানের খসড়া তৈরী করতো, তারপর অতনুকে পীড়াপীড়ি করতো সেটা সই করে দেওয়ার জন্যে। অতনুকে নিয়ে লেকে বেড়াতে যেতো, সিনেমায় যেতো, কিন্তু গল্প করতো তার মাসতুতো বোন, পিসতুতো বোন, খুড়তুতো বোনেদের। এর স্বামী অমুক, ওর স্বামী অমুক, এ ওই করে, ও এই করে, এই সব। অতনু যদি একটু ওর হাত ধরতেও চাইতো, ও বলতো,—এখন না, বিয়ের পর। এসব অতনুর কেন ভালো লাগবে বলো? সে শিল্পী। সে প্রভাব প্রতিপত্তির শান্তি সোয়াস্তি নিশ্চয়তার প্রত্যাশা করে না আর দশজনের মতো। সে ভালো আঁকতে চায়, সে তার কাজের স্বীকৃতি চায়। অবসর সময়ে সে চায় পূর্ণগ্রহণের মতো বলয়গ্রাস ভালোবাসা, তার সমস্ত হৃদয় মন, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা দিতে হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা সে চায় না। সে আর্টিস্ট, নিজের আর্টকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সবার কাছে সে যা পাবে তার বদলে কিছু ভালো ছবি ছাড়া আর কিছুই সে দিতে পারবে না। তাই তার কাছ থেকে ভালোবাসা পেতে হ শুধু তার গৃহিণী হলে চলবে না, তার কাছে তার সমস্ত আর্টের প্রতীক হয়ে উঠতে

হবে। এই সমন্বয় না হলে আর্টিস্টের ভালোবাসা পাওয়া যায় না।"

আমি বললাম, "যাই বলো সুজাতাদি, কল্যাণী ওকে ভালো-বাসতো। ওর খুব মনে লেগেছে।"

সুজাতাদি হাসলো। বললো, "ওকে নয়। নিজের এক কল্পনার স্বামীকে। অতনুর মধ্যে সে তাকে পেতে চেয়েছিলো। মাটির খেলনা ভেঙে গেলে একটি বাচ্চা মেয়ের মনে যতো লাগে কল্যাণীর মনে তার বেশী লাগেনি। দু-দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বড্ড নির্মম মনে হোলো সুজাতাদির কথাগুলো।

কিছুদিন পরে কল্যাণীদির সঙ্গে একজন ডাক্তারের বিয়ে হয়ে গেল। বেশী পণ দিতে হয় নি,—সবাই খুব খুশী। কল্যাণীদিও। সেই ডাক্তার আবার অতনুর খুব বন্ধু এবং তার ছবির খুব অনুরাগী। কল্যাণী ভালো বর পেয়ে এত খুশী যে, অতনুকেও বোধ হয় ক্ষমা করলো। কারণ, দেখলাম ওদের বাড়ি অতনুর যাওয়া আসা অক্ষুণ্ণ রইলো। অতনুর সঙ্গে কল্যাণীদি একটা সহজ সম্পর্ক বজায় রাখলো, যেন ওদের মধ্যে কোনোদিন কিছুই হয় নি।

তবে সুজাতাদিকে ক্ষমা করেনি কল্যাণী। ওদের মধ্যে আর মুখ দেখাদেখি ছিলো না।

কল্যাণীদির স্বামী চাকরি করতো বম্বেতে। তার সঙ্গে কল্যাণীদি বম্বে চলে গেল কিছুদিন পর। যাওয়ার আগে কল্যাণীদি আমাদের সবাইকে খেতে ডেকেছিলো। অতনুকেও ডেকেছিলো।

কিন্তু সুজাতাদিকে ডাকেনি।

আমার একজন বন্ধু আছে, কলকাতার এক নামকরা কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। ভালো সমালোচক, দু-চারটে বই লিখেছে। অতনুর গল্প তার কাছে মাঝে মাঝে করতাম, কারণ সে

চিত্রকলাও খুব ভালো বোঝে, ওর ছবির নাম হতে শুরু হওয়ার পর তার খুব অনুরাগী হয়ে উঠেছিলো।

আমি অতনুকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলাম,—অবশ্যি তার নামটা বদলে দিয়ে। সেখানে নায়কের নাম দিয়েছিলাম অনুতোষ হালদার, সুজাতাদির নাম দিয়েছিলাম মিনতি, আর কল্যাণীর নাম চামেলী। তিন-চার পরিচ্ছেদ লিখে আমার সমালোচক বন্ধুকে শোনালাম।

সে মন দিয়ে সবটা শুনলো। তারপর বললো, "দেখ অনুতোষ হালদারের সঙ্গে চামেলীর বিয়ের ঠিক হোলো, এমন সময় চামেলীর বন্ধু মিনতির সঙ্গে অনুতোষের প্রেম হোলো। চামেলী তখন অনুতোষকে পরিত্যাগ করে আরেকজনকে বিয়ে করলো, শুধু এই কাঠামোর উপর তুমি গড়ে তুলতে চাও একজন শিল্পীর জীবনের কাহিনী?"

সমালোচকের কথা শুনে আমি একটু অপ্রস্তুত বোধ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে কি করতে বলো আমায়?"

"দেখ, এর সঙ্গে প্রেম করলো, তার সঙ্গে শয্যাগ্রহণ করলো, অন্য কাউকে বিয়ে করলো,—এসব অত্যন্ত পানসে ব্যাপার। ওসব কলেজী প্রেম মাখা গল্প সিরিয়াস পাঠকের জন্যে নয়। ওসব ছাড়ো। শিল্পীর জীবনের যে বেঁচে থাকার নিষ্করুণ সংগ্রাম, তার গল্প বলো। শিল্পী কি করে তার সাধনার মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ব্যথা বেদনা গ্লানির উপরে উঠে যায়, কেমন করে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও পেয়ে যায় তার শিল্পীজীবনের সার্থকতা, কেমন করে তার সাধনাকে ব্যর্থ করে দিতে চায় বর্তমানের অরাজক সমাজব্যবস্থা, কেমন করে সে তিলে তিলে নিজের প্রাণ দিয়ে সাধারণ মানুষকে সন্ধান দেয় নতুন বৃহত্তর জীবনের, কেমন করে তার নিজের যুগের ইতিহাস সে ছবির মধ্যে ধরে রাখে ভাবীকালের জন্যে,—এসবের গল্প বলো। শিল্পীর অন্তর্জীবনের দুঃখ

বেদনা আনন্দ উপলব্ধি, এসবের সন্ধান দাও গল্পের মধ্যে দিয়ে। মিনতি আর চামেলীর ঘটনা, শিল্পীর জীবনে এসব নিতান্ত গৌণ ব্যাপার।”

আমি বললাম, “এসব আসলে অতনুর জীবনের ঘটনা থেকে নিয়েছি।”

“তাই নাকি!” সে নিরাসক্তভাবে বললো, “তা, এসব আমাদের রাইমোহনের জীবনেও পেতে, তোমাদের হরিচরণের জীবনেও পেতে। তোমার নিজের কথাই ভাবো না। তুমি মনে মনে সুজাতাকে ভালোবাসতে, তাকে দিদি ডাকো আর যাই ডাকো। যখন ওকে বলবে বলবে ভাবছিলে, তখন জানতে পারলে যে, ওর সঙ্গে অতনুর এমন একটা সম্পর্ক, যেটা তোমার নিজের হলে তুমি সুখী হতে অথচ তোমার সমস্ত সংস্কার তোমাকে সে সম্পর্ক অনুমোদন করতে দেয় না অন্যের মধ্যে সেটা দেখলে। তোমার মন বিরূপ হয়ে উঠলো। আর তারপর আমার শালী ইন্দিরার অনুরক্ত হয়ে উঠলে।”

আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠলো।

অতনুকে মডেল করে শিল্পী অনুতোষ হালদারের সেই গল্প আমার আর লেখা হয়নি। ভেবেছিলাম, সুজাতাদির সঙ্গে যদি অতনুর বিয়ে হয়, অতনু যদি বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী হয়, তাহলে মিনতির সঙ্গে অনুতোষ হালদারের বিয়ে দিয়ে আমার গল্প শেষ করবো।

কিন্তু সে গল্প যে শেষ করা হয়নি আজ অতনুর কথা ভাবতে বসে সে কথাই আমার বারবার মনে পড়ছে।

চার ॥

তবে অতনুর অন্তর্জীবনের কিছু খবর জানবো, তার শিল্পী জীবনের নিষ্করুণ জীবনসংগ্রামের কিছু সন্ধান রাখবো, সেই বাসনা প্রথম দিকে আমার মনে মনে ছিলো বেশ কিছুদিন। কিন্তু আজ তার কথা বলতে বসে দেখছি, তাকে যখন যেমন দেখেছি, ঠিক সেভাবে বর্ণনা করা ছাড়া আর কছু সম্ভব নয়। তার মুখে যখন যেকথা শুনেছি, তার উল্লেখ করা ছাড়া তার চিন্তা ভাবনা মনোবৃত্তির আর কোনো ইঙ্গিত দেওয়ার উপায় নেই। কারণ অতনু যার সঙ্গে যতো অন্তরঙ্গভাবেই মিশুক না কেন, নিজের চারদিকে এমন একটা মানসিক দূরত্বের দেওয়াল তুলে রাখতো যেটা ডিঙানো সম্ভব হোতো না কারো পক্ষে।

যদি অনুতোষ হালদারের গল্প বলতাম, তাহলে বানিয়ে কল্পনা করে অনেক কিছু লেখা যেতো। সত্যিকারের অতনুর গল্প বলতে গেলে সেটা সম্ভব নয়।

অতোটা তখন বুঝিনি। অতনুর বাড়ি যেতে শুরু করলাম ঘন ঘন।

ভবানীপুরের দিকে একটি নিরালা গলির মধ্যে দুটো ঘর নিয়ে একা থাকতো অতনু। বড়ো ঘরটা ছিলো তার স্টুডিও। ছোটো ঘরটিতে থাকা, খাওয়া, শোওয়া। চাঁকর বাকর ছিলো না। নিজেই ইকমিক কুকারে দুটো রান্না করে খেতো। আসবাবপত্তরের মধ্যে একটি ক্যাম্পখাট, একটি কেরোসিন কাঠের টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটি বইয়ের শেল্‌ফ্।

আমি প্রথম প্রথম অবাক হতাম, কেন অতনুর এই দীন দশা। শুনেছিলাম খুব অল্প বয়েসেই ওর বাবা ওকে ইউরোপ পাঠিয়েছিলেন। তাই যদি হয় তো ওদের বাড়ির অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভালো। পরে

শুনেছিলাম ব্যবসায় ফেল মেরে ওর বাবা শেষজীবনে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। উনি বেঁচে নেই। অতনুর দাদা নতুন করে ব্যবসা গড়ে তুলে বাড়ির অবস্থা ফিরিয়েছেন। কিন্তু অতনুর সঙ্গে তাঁর কোনো বনিবনাও নেই, কোনো যোগাযোগও নেই।

তবে অতনুর কোনো অভাব ছিলো না, কোনো অভাববোধও ছিলো না। কিছু ছবি বিক্রি হোতো, মাঝে মাঝে কিছু কমার্শিয়্যাল কাজও করতো,—আর, যা রোজগার করতো, তারই মধ্যে বেশ চালিয়ে নিতো। চিত্রশিল্পী হিসেবে সে খানিকটা স্বীকৃতিও পেতে শুরু করেছিলো। তার ছবি কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, কেউ বুঝুক বা না বুঝুক, সে যে একজন প্রতিভাধর, সে যে নতুন কিছু একটা করার চেষ্টা করছে, সে কথা স্বীকার করতো সবাই।

তার মধ্যে শুধু একটা অশান্তি, একটা অধীরতা দেখেছিলাম। ছবি এঁকে সে খুশী হতে পারতো না কিছুতেই। বলতো, "না এঁকে পারছি না বলে আঁকছি। কিন্তু এঁকে তৃপ্তি পাচ্ছি না। যা আমি আঁকতে চাই, এ তো সে নয়। কিন্তু কি আমি আঁকতে চাই সেটাই এখনো জানি না।"

আমার বন্ধু সুরজিতের বোন কেতকী ওর দাদার সঙ্গে প্রায়ই যেতো অতনুর স্টুডিওতে। অতনু কেতকীকে ফুল-সাজানো শেখাতো। ফুল-সাজানো কেতকীর নেশা হয়ে উঠলো। সে যে শুধু অতনুর কাছেই শিখতো তা নয়, পাশ্চাত্য এবং জাপানী পুষ্পবিন্যাসরীতির উপর নানারকম বই কিনে সেগুলো দেখেও শিখতে লাগলো নানা-রকমের ফুল সাজানো।

ওদের বাড়ি গিয়ে দেখতে পেতাম এক একদিন এক এক রকমের পুষ্পবিন্যাস। কলকাতায় আজকাল ফুল-সাজানোর একটা রেওয়াজ এসেছে, যদিও প্রায় সব ক্ষেত্রেই ফুল-সাজানো মানে এক বাণ্ডিল ফুল একটি ফুলদানির মধ্যে চেপে গুঁজে দেওয়া। কিন্তু সে-

সময়কার কলকাতায় এও ছিলো না। ফুল তো দেখাই যেতো না কারো বসবার ঘরে, বরং অনেক শৌখিন সাজানো ড্রয়িংরুমে দেখা যেতো শুধু কাগজের ফুল, এবং আশ্চর্য ব্যাপার, এটা কেউ রুচির চরম বিকৃতি বলে মনে করতো না।

কিন্তু ফুলদানি ও ফুলের পাত্রে পুষ্পবিন্যাসও যে এক উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা সেটা বুঝতাম কেতকীর ফুল সাজানো দেখে। অন্যান্য শিল্পকলার মতো এরও নিজস্ব রীতি ও পদ্ধতি আছে। সে সব যার জানা নেই তার পক্ষে নিত্য নতুন পুষ্পবিন্যাস সৃষ্টি করা অসম্ভব। কিন্তু কেতকীকে দেখতাম দুটো তিনটে ফুল, দুটো তিনটে পাতা আর মাঝে মাঝে একটি দুটি শুকনো ডাল দিয়ে নিত্য নতুন পুষ্পবিন্যাস রচনা করতো, প্রত্যেকটি একটি নতুন গীতি-কবিতার মতো।

প্রশংসা না করে পারলাম না। সত্যি ফুল সাজাতে শিখেছে কেতকী।

সুরজিত তদ্দিনে ভক্ত হয়ে উঠেছে অতনু মজুমদারের ছবির। আর্টের উপর নিয়মিত পড়াশুনো করছে নানারকম বই যোগাড় করে।

"অতনুদার ছবি, সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা," বললো সুরজিত, "ওর উপর পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্টদের প্রভাব খুব। আমাদের দেশে এখনো সেজান, গোগ্যাঁ, ভ্যানগগ্, স্যুরাত, এরকম কেউ জন্মালো না। এখনো আমাদের ছবি পঁচাত্তর বছর পিছিয়ে আছে। আমাদের শিল্পীদের ছবি বড্ড লিরিক্যাল, বড্ড বেশী ফর্ম-সর্বস্ব, ইমোশান একটা ক্ষণিক মুহূর্তের, সর্বাঙ্গিন ও সামগ্রিক নয়। অতনুদার স্পেস্‌এর ট্রিটমেন্ট আশ্চর্য। যে কোনো বস্তুর উপর আলোর খেলা শুধু একটি বিশেষ মুহূর্তকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে নয়, বিভিন্ন ফর্মগুলোকে একটা নিবিড় ঘনত্ব দিয়ে তার কালাতীত রূপকে ফুটিয়ে তুলবার জন্যে।

এই পারিভাষিক ভাষা আমার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য। ঝরণার মতো বলে গেল সুরজিত। হয়তো একটা নিরুপায় ভাব ফুটে উঠেছিলো আমার মুখে। তাই দেখে কেতকী হেসে ফেললো। বললো, "দাদা যে-ভাবে অতনুদার ছবি বুঝতে চায় এবং বোঝাতে চায়, তাতে সমস্ত ব্যাপারটা আরো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।" আমি অতনুদাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি বিদেশী টেকনিকের নকল করেন কেন? আপনি যে টেকনিকে ছবি আঁকেন, আমাদের দেশের জীবনধারার সঙ্গে সে কি খাপ খায়?"

কেতকীর কথা শুনে অতনু নাকি কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে বসে ছিলো। তারপর বলেছিলো,—দেখ কেতকী, জীবনধারা যুগ থেকে যুগে পাল্টে যায়, এজন্যে চিত্রকলার টেক্‌নিকও পাল্টে যায়। ক্ল্যাসিক্যাল ইউরোপীয় প্রভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমাদের অবন্ ঠাকুর নন্দলাল বোস প্রভৃতিকে প্রয়োজন ছিলো। অজন্তা, রাজপুত, মোগল, এসব বিভিন্ন রীতির পুনর্প্রবর্তন দরকার ছিলো আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হবার জন্যে। আমাদের লোকশিল্পের রীতি যে কতো বেশী জোরালো, তা দিয়ে যে-কোনো বিষয়বস্তু যে ভাবের ঐশ্বর্যে প্রাণময় করে তোলা যেতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্যে দরকার ছিলো যামিনী রায়কে। কিন্তু সামন্ততন্ত্র ও কৃষিসভ্যতার পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে আমাদের দেশে এক নতুন শিল্প-সভ্যতার সূচনা হচ্ছে। সুতরাং আজ যে কারণে মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রদের তাকের উপর তুলে রেখে জীবনানন্দ সুধীন দত্তের কবিতা নিয়ে বসতে হয়, সে কারণেই এদ্দিন যে রীতিতে ছবি আঁকা হয়ে এসেছে, সেটা আর চলবে না। এখন নতুন চিত্র-রীতি চাই, নতুন আঙ্গিক চাই।

আমি ঠিক বুঝিনি অতনুর কথাগুলো। কেতকীও আমায় বোঝাতে পারেনি,—হয়তো ভাষার উপর তার যথাসাধ্য দখল নেই বলেই। কিন্তু তার চোখ দেখে মনে হয়েছিলো, সে নিজে ঠিক্ বুঝেছে।

সুরজিতের সঙ্গে একদিন গিয়েছিলাম অতনু মজুমদারের স্টুডিওতে। ওই একই প্রশ্ন আমি অতনুকে করেছিলাম। একই উত্তর দিয়েছিলো সে।

দ্বিতীয়বার শুনেও বুঝিনি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কেন?"

"আমাদের সমকালীন জীবনকে ছবির মধ্যে ধরতে চাই পরিমল," অতনু উত্তর দিয়েছিলো, "আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের সমস্ত ব্যথা বেদনা গ্লানির মধ্যে জীবনের শাশ্বত সুন্দর রূপকে খুঁজে পেতে চাই। আজকের দিনের ছবি ছোটো গল্পের মতো একটি চলতি মুহূর্তকে ধরে রাখবার চেষ্টা করে না, সে উপন্যাসের মতো একটা সামগ্রিক রূপ পেতে চায়। পাষাণ-প্রতিমার সামনে বসে শুধু স্তোত্রপাঠ করলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করতে পারে না, দেবীর চিণ্ময়ী রূপকে প্রত্যক্ষ করতে হলে তাকে বিস্তৃত করতে হয় তার অন্তর্দৃষ্টি।"

আমরা চুপ করে শুনছিলাম। অতনু কথা বলতে বলতে তুলি বুলোচ্ছিলো একটি বিরাট ক্যানভাসেয় উপর। তুলি নামিয়ে সেটি ধুয়ে ন্যাপকিনে পুঁছে নিলো। তারপর আরেকটি তুলিতে অন্য রং নিয়ে ছবির জায়গায় জায়গায় এলোমেলো ছোপ লাগাতে লাগাতে বললো, "কৃষ্ণের কাছ থেকে একটা গভীর জীবনবোধ পেয়েছিলেন বলেই অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু এক সুন্দরকান্তি সারথিকে চর্মচক্ষুতে দেখে অর্জুন "পশ্যামি দেবংস্তবদেব দেহে" বলে বিশ্বরূপ বর্ণন করতে শুরু করেন নি। আজকের দিনের শিল্পীকেও ঠিক তেমনি এক গভীর জীবনবোধের মাধ্যমে তার ছবির মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করবার সাধনা করতে হয়। একটা বাঁধাধরা সংস্কারবিরোধী চিত্ররীতির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকলে জীবনদেবতা শিল্পীর কাছে নিজেকে ধরা দেন না।"

অতনু তুলি রেখে দিয়ে আস্তে আস্তে জানলার কাছে গিয়ে

দাঁড়ালো। চোখ বুলিয়ে নিলো বাইরের পৃথিবীর উপর। তারপর মুখ না ফিরিয়েই বললো, "আমার জীবনদেবতা অনন্তরূপম্। তাকে বুঝতে হলে নিত্য নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজন হয়।"

অতনুর কথা শুনে আমি একটু বিহ্বল বোধ করছিলাম। আমার মুখ দেখে অতনু হাসলো। তারপর বললো, "সামনের হপ্তায় আমার ছবির একজিবিশান হচ্ছে আর্টিস্ট্রি হাউসে। প্রিভিউতে আসিস। আমি কার্ড পাঠিয়ে দেবো।"

অতনু মজুমদারের বক্তব্যের খানিকটা বুঝলেও তার ছবির প্রদর্শনীতে গিয়ে বুঝতে পারলাম না তার ছবির সঙ্গে তার বক্তব্যের মিল কোথায়। দুর্বোধ্য ঠেকলো প্রায় প্রত্যেকটা ছবিই। ছাপানো তালিকায় ক্যাপশান মিলিয়ে ছবি বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে সব কিছু আরো গুলিয়ে গেল। তখন ক্যাটালগ পকেটে পুরে এমনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম ছবিগুলো। বেশ ভালো লাগলো, কিন্তু কেন, তাও বুঝে উঠতে পারলাম না। হয়তো চোখ দুটোকে পরিতৃপ্ত করেছিলো বর্ণ, রেখা ও সমষ্টির সমন্বয়।

একবার শিল্পীর সামনাসামনি হতেই সে একটু হাসলো। বোধ হয় আঁচ করেছিলো আমার মনের অবস্থা। বললো, "বুঝবার চেষ্টা না করে অনুভব করবার চেষ্টা কর। তাতে অনেক বেশী রস পাবি।"

অনেক অভিজাত পুরুষ ও মহিলা চিত্রবিলাসী এসেছিলেন প্রদর্শনী দেখতে। শুনলাম তাদের প্রশংসা, আর্টের দুর্বোধ্য পরিভাষায় অতনুর বিভিন্ন ছবির মূল্যবিচার। কিছু ছবি বিক্রীও হোলো।

প্রদর্শনীতে গিয়েছিলো সুজাতাদিও। কিন্তু সেখানে দেখলাম অতনুর সঙ্গে সে বেশী কথাবার্তা বললো না। অতনু পরিবেষ্টিত রইলো তার অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে।

সুজাতাদিকে দেখলাম কেতকীর সঙ্গে খুব গল্প করছে। কেতকী খুব সরল মেয়ে। পুষ্পবিন্যাস-কলা আলোচনা করছে সুজাতাদির সঙ্গে। বিভিন্ন পুষ্পবিন্যাসের কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর স্টিল-লাইফ্ ছবি ছিলো, তাই উপলক্ষ করে তাদের আলোচনা।

তার পরদিন বিকেলবেলা সুজাতাদির সঙ্গে গল্প করছিলাম ওর বাড়িতে বসে। জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা সুজাতাদি, অতনুদার ছবি বোঝা যায় না কেন?"

"ও নিজের জীবনকে যেদিন পুরোপুরি বুঝতে পারবে, সেদিন তোমরাও ওর ছবি বুঝতে পারবে," সুজাতাদি উত্তর দিলো।

"কিন্তু ওর ছবি এমনি দেখতে ভালো লাগে কেন?"

"ও যে জীবনকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করছে, শুধু সেই নিষ্ঠার জন্য ওর ছবিতে একটা সাব্জেক্টিভ আবেদন আছে।"

"ওর ছবি এক-এক সময় মনে হয় বড্ড রুক্ষ, বড্ড অসুন্দর," আমি বললাম।

"ওর মনে এখনো নানারকম সংশয় আছে," অন্যদিকে তাকিয়ে আনমনে উত্তর দিলো সুজাতাদি, "অনেক সংঘাত আছে।—বোধ হয় সেজন্যেই।"

অনেকক্ষণ আনমনা ছিলো সুজাতাদি, তারপর হঠাৎ বললো, "পরিমল, একটি ছবি দেখবে? কাউকে বলতে পারবে না কিন্তু।"

অনুরোধের ধরন শুনে একটু চিন্তিত হলাম।

"এসো আমার সঙ্গে।"

সুজাতা আমায় নিয়ে গেল তার শোয়ার ঘরে। সেখানে দেওয়ালে টাঙানো একটি ভারী সুন্দর পোর্ট্রেট।

"অতনু এঁকেছে," বললো সুজাতাদি।

"সে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু পোর্ট্রেটে কী সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে সুজাতাদি!"

সুজাতাদির মুখ লাল হোলো। হেসে বললো, "ও বোধ হয় সত্যি সত্যি আমি নই। অতনু তার চোখ দিয়ে আমায় যেরকম দেখেছে, ঠিক সেরকমই এঁকেছে।"

আমি একটু হেসে চুপ করে রইলাম। সুজাতাদি বোধ হয় বুঝলো আমার হাসির অর্থ। বললো, "কী বোকা তুমি পরিমল। এটা বোঝো না? অতনু সব কিছুর মধ্যে সুন্দরকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে।"

"অতনুদা কি তোমার মধ্যে সুন্দরকে খুঁজে পেয়েছে?" আমি না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

"ওকেই জিজ্ঞেস কোরো," বলে সুজাতাদি মুখ নিচু করলো।

দু-চারদিন পর অতনুর সঙ্গে যখন দেখা হোলো, ওকে বললাম, "অতনুদা, তোমার আঁকা সুজাতাদির ছবিটা দেখলাম। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো সুজাতাদিকে, ও সত্যি সত্যি যতো সুন্দর, তার চাইতে অনেক বেশী।"

অতনু কিছুক্ষণ চুপচাপ তুলি বুলালো একটি অসমাপ্ত ছবির উপর। তারপর বললো, "আমি সুজাতার আরেকটি ছবি এঁকেছি। দেখবি? কাউকে দেখাইনি এ পর্যন্ত। সুজাতাকে বলবি না কিন্তু।"

ছবি দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। এ সুজাতাদি! ভাবলাম, অতনু আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, না কি?—ছবির মধ্যে দেখলাম ফর্মের আশ্চর্য সুন্দর বিকৃতি। নীল পটভূমিকায় সবুজ রঙের প্রাধান্য, তার মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল বেগ্‌নি আর সিঁদুরে লাল ছিটানো। তিনটি চরিত্র পাশাপাশি—একজন আরেকজনের মধ্যে খানিকটা মিশে রয়েছে। প্রথমটি সুঠাম কঙ্কাল, তার পরেরটি অসুন্দর নগ্নতা, অন্যটি সাজ-সজ্জিতা। কঙ্কালের মুখে দুটি আশ্চর্য সুন্দর চোখ, আয়ত, গভীর, আহ্বানময়তায় মুখর। নগ্নার মুখে কোনো চোখই

নেই, সজ্জিতার কপালে শুধু একটি চোখ, দেবী প্রতিমার তৃতীয় নয়নের মতো। প্যাটার্নের জটিলতার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন মনে হয় তিনটি মূর্তি এক হয়ে মিশে যাচ্ছে, চকিতের জন্যে মনে হয় ঘন অন্ধকারে আকস্মিত বিদ্যুৎ স্ফুরণের যেন সুজাতার মুখখানি দেখলাম। এক মুহূর্তের জন্যে।

এ ছবি তখন বুঝিনি। এখন সেটি আছে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে। মাঝে মাঝে যখন দেখি, মনে হয় ছবিটি মনস্তাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। মনে হয় যেন অতনু কোনো মানবী মূর্তি আঁকবার চেষ্টা করেনি, এঁকেছে একটি মানসিক অবস্থার ছবি।

আমায় হতবাক দেখে অতনু হেসে বললো, "এই হচ্ছে আমার সুজাতা, আমার আসল সুজাতা।"

তার মুখের নির্বিকল্প নিরাসক্ত ভাব দেখে আমি অবাক হয়ে তাকালাম তার দিকে।

সে নিজের মনে বললো, "কী সাংঘাতিক মেয়ে! আমায় বিয়ে করতে চায়!"

একদিন অতনুকে দেখলাম খুব নিবিষ্টচিত্তে একটি বইতে ছাপানো একখানি ছবি দেখছে। আমায়ও দেখালো ছবিটা। আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। তলায় নাম দেখলাম পিকাসোর। অন্যপাশে ছবির নাম,—Guernica।

এই বিশ্ববিখ্যাত ছবির মর্মার্থ সেদিন কিছুই বুঝিনি। অতনু আস্তে আস্তে বললো, "স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের সময় হিটলারের বোমারু বিমান এই শহরের অসহায় অধিবাসীদের উপর নৃশংসভাবে বোমা-বর্ষণ করে। তাই উপলক্ষ করে আঁকা হয়েছে এই ছবি,—ফ্যাসি-বাদের অনৈতিকতার, যুদ্ধত্রস্ত পৃথিবীর এক রূপক চিত্রণ। এবং সেই শহরের নামে ছবিটির নাম।"

বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্‌টিয়ে অতনু আমায় আরেকটি ছবি দেখালো,—গোয়ার আঁকা মাদ্রিদের নাগরিকদের উপরে নেপোলিয়ানের সৈন্যদের গুলি চালানোর একটি দৃশ্য। তারপর বললো, "গুলি চালানোর সময়কার ছবি দেখে আঁকা যায়, তার একটা বাস্তব চিত্রণ সম্ভব। কিন্তু যে মুহূর্তে বোমা পড়ছে, বিস্ফোরণ হচ্ছে, মানুষ টুকরো টুকরো মাংসপিণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই দুঃস্বপ্নের ছবি কি করে চোখের-চেনা ফর্মের মাধ্যমে আঁকবে?" বলতে বলতে নিজের আঁকা কয়েকটি ছবি বার করে দেখালো।

প্রত্যেকটিই দুর্বোধ্য রূপক ছবি। কিছু বিশেষ না বুঝলেও অভিভূত হলাম। মনে হোলো ভয়াবহ, তবু সুন্দর।

অতনুই বুঝিয়ে দিলো,—এটি গত দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতার রাজপথের একটি দৃশ্য। এটি খিদিরপুরে বোমাবর্ষণের দৃশ্য। এটি গড়পার অঞ্চলে দাঙ্গায় সময় একদিন···!

তারপর হঠাৎ বললো, "এসবে আমার মন ভরছে না। আমার আরো সুন্দর কিছু চাই। এসব আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, এসব যেন বড্ড জটিল। জটিলতার মধ্যে সুন্দরকে কতোখানি পাওয়া যেতে পারে? সুন্দর আছে সহজের মধ্যে। আমার ছবি আরো সহজ হতে হবে।"

আমি একটু ঘাড় নাড়লাম, কি বলবো এবং কিভাবে বলবো ভেবে না পেয়ে।

অতনু বলে গেল, "কিন্তু আমাদের এই নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার ছবির বিষয়বস্তু জটিল না হয়ে উপায় নেই, ছবির আঙ্গিক যতোই সহজ হোক না কেন ইমোশান বা ভাবাবেগের জটিলতা ছবিতে এত বেশী যে, সুন্দরকে পুরোপুরি ধরতে পারছি না। তাই ভাবছি এসবের মধ্যে থেকে পালিয়ে যাবো।"

মনে হোলো এ শুধু রূপক সংলাপ।

"আবার নতুন করে শুরু করবো," বলে গেল অতনু। বলতে

বলতে অর্ধসমাপ্ত একটি ছবির উপর তুলি বুলোতে শুরু করলো। তারপর হঠাৎ ছবিটি তুলে দু-টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

কিন্তু ওর কথায় কোনো চাঞ্চল্য দেখলাম না।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "অতনুদা, কেতকীর ফুলসাজানো দেখেছো?"

"কেতকী?" ঝলমল করে উঠলো অতনুর মুখ, বললো, "মেয়েটি খুব ভালো। যদি কোনোদিন আমার ক্যানভাসে দেখ একটি শ্বেতপদ্মের ছবি, মনে করবে সেটি কেতকীর পোর্ট্রেট এঁকেছি। সে পেয়ে গেছে।"

"কি পেয়ে গেছে," আমি জিজ্ঞেস করলাম বুঝতে না পেরে।

"আমি যা খুঁজছি, কেতকী পেয়ে গেছে।" একটু চুপ করে রইলো অতনু, তারপর আস্তে আস্তে আবার বললো, "আমি যা খুঁজছি কেতকী পেয়ে গেছে।"

"কি পেয়ে গেছে?"

"সে খুব সহজে সুন্দরকে পেয়ে গেছে। ওর মিডিয়ামটাই এমন যে সুন্দর খুব সহজ হয়ে ধরা দেয়। ওর ঘরে শুধু একটা কি দুটো ফুলদানিতে দুটো তিনটে করে ফুল ও পাতার বিন্যাস, কিন্তু সেই ফুল সাজানোতে এমন একটা আত্মনিবেদন আছে যে, মনে হয় কোনো মন্দিরে ঢুকলাম। ললিতকলায় সেই শুচিতা আনতে হলে শুধু শিল্পী হলে চলে না, তার উপরে আরো কিছু হতে হয়।"

কয়েকদিন কারো সঙ্গে দেখা হয় নি, কারো খোঁজ-খবর নিতে পারি নি।

একদিন পথে সুরজিতের সঙ্গে দেখা হতে বললাম, "চলো, অতনুদার ওখানে যাই।"

"সে তো এখানে নেই," সে উত্তর দিলো।

শুনলাম অতনু কলকাতার বাইরে এক গাঁয়ে চলে গেছে। নতুন

করে ছবি আঁকছে সেখানে। ওর ছবির আঙ্গিক নাকি পাল্টে গেছে।

"এবার অতনুদা একজিবিশানে যে ছবিগুলো দেবে, সেগুলো অপূর্ব। শহরে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। কাল আমি আর কেতকী গিয়েছিলাম। ট্রেনে শুধ্ ঘণ্টাখানেকের পথ।"

সুজাতাদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার, অতনু হঠাৎ কলকাতা ছাড়লো কেন?"

দেখলাম সুজাতাদির পোশাকে একটা অবিন্যস্ত ভাব। চোখ দুটো জ্বলছে।

আমি দু-চার মিনিট চুপ করে রইলাম, তারপর বললাম, "চলো, একদিন দেখে আসি অতনুদার নতুন ছবি। ট্রেনে নাকি শুধ্ ঘণ্টা-খানেকের পথ।

"না।" গম্ভীর গলায় বললো সুজাতাদি।

"কেন?"

"ও নিজেই ফিরে আসবে। ও কি মনে করেছে? পালিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়? জটিলকে সহজ করা যায়?"

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। শুনলাম, অতনু কাউকে চিঠিপত্র দেয় না। শুধ্ ছবি আঁকছে।

পাঁচ

আরো দু-মাস কেটে গেল। তখন আস্তে আস্তে একজন দুজন করে খোঁজ করতে শুরু করলো অতনুর কি হয়েছে, ও এদ্দিন কলকাতার বাইরে বসে কি করছে। ও যে কলকাতায় নেই, কলকাতার বাইরে একটি গাঁয়ে বসে ছবি আঁকছে, সে খবর অনেকেই জেনে গিয়েছিলো ইতিমধ্যে, কিন্তু সে যে সেখানে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসবে এটা কেউ ভাবতে পারতো না। সবাই ভাবতো এ শুধু আর্টিস্টের খেয়াল, শহর একঘেয়ে লাগছে, তাই গাঁয়ে গিয়ে বসেছে। দুদিন পরে সেখানে একঘেয়ে লাগবে, তক্ষুনি সেখানকার মায়ামমতা কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসবে।

কিন্তু এদ্দিন পরও যখন তার দেখা নেই, তখন সবাই বলাবলি শুরু করলো, ব্যাপার কি? ওর দেখা নেই কেন? যে লণ্ডন প্যারিসে বড়ো হয়েছে, সে অজ পাড়াগাঁয়ে আছে কি করে? কিসের মোহে পড়ে আছে? কিসের আকর্ষণে? কি আছে সেখানে? ছবি আঁকবার জন্যে পনেরো কুড়ি দিন যথেষ্ট। কোলকাতা থেকে যখন ঘণ্টাখানেকের পথ, তখন কোলকাতায় থেকেই তো সপ্তাহান্তে যাওয়া-আসা করতে পারে। অন্য আর্টিস্টেরা তো তাই করে।

অন্তরঙ্গ যারা, ওদের মনে অন্য প্রশ্ন। ওর চলছে কি করে? ওর কোনো সঞ্চয় নেই, কোনো বাঁধা রোজগার নেই। এই কমাসে সে নিশ্চয়ই কোনো ছবি বেচে নি, বেচলে শোনা যেতো। সুতরাং কিছু আয়ও করেনি। আগেরবার ছবির প্রদর্শনী করে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলো বটে, কিন্তু সে টাকা ওড়াতে তার বেশীদিন লাগেনি।

কি করে সে টাকা ওড়ানো হয়েছিলো, সে খবর তার অন্তরঙ্গেরা জানে বৈকি। বিশ্বাস হয় না, কিন্তু ওর মতো বোহেমিয় ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

আমি জানতাম না। প্রথমে শুনলাম অমিতাভর কাছে। শুনে বিশ্বাস করিনি, ভাবলাম ওর দিদির সঙ্গে অতনুর বিয়ে হয়নি বলে ও এখন নানা কথা অতিরঞ্জিত না করে পারছে না। পরে একদিন শুনলাম অতনুর অত্যন্ত বন্ধু আমার পরিচিত এক সংগীত-শিল্পীর কাছে।

টাকা পেয়ে সে আগের দেনা মিটিয়েছে, সারা বছরের প্রয়োজন মত রং কিনেছে, ক্যানভাস কিনেছে, এক বছরের বাড়ি ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছে, বন্ধু-বান্ধবদের শহরের অভিজাততম রেস্তর াঁয় খাইয়েছে,—তা ছাড়া নাকি তিন চার দিন অতনু তার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা শহরের মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলো। আমার মন এমন কিছু অনুদার নয়, কিন্তু তার সেই তিন চারদিনের জীবনযাত্রার ইতিহাস এবং তার সঙ্গীদের নাম শুনে আমিও স্তম্ভিত হয়েছিলাম। একজন তো সেই সংগীতশিল্পী, তা ছাড়া একজন ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক, একজন খ্যাতনামা গবেষক আর দুজন সুপরিচিত কবি।

আমার মনে পড়লো, সে সময় দু-তিনবার অতনুর বাড়ি গিয়ে-ছিলাম, ওর দেখা পাইনি। একদিন দেখেছিলাম একটি গাড়িতে আরো চার পাঁচজনের সঙ্গে সেণ্ট্র্যাল অ্যাভিনিউ ধরে উড়ে চলেছে। তারপর একদিন হঠাৎ দেখা হয়েছিলো গ্রেট ইস্টার্নের সামনে,—ভেতরে ঢুকছে দুজনের সঙ্গে, এমন সময় হঠাৎ দুজনে দুজনকে দেখে ফেললাম।

ওরকম সময় চিনতে না চেয়ে এগিয়ে যাবে বা দেখতে না পাওয়ার ভান করবে, সে ছেলে অতনু নয়। অথচ আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবার ইচ্ছে যে তার ছিলো তাও নয়। সে সময় তার কথা-

গুলো খুব সরল মনে নিয়েছিলাম, কিন্তু আজ বুঝতে পারি সে সব ছিল অতি সূক্ষ্ম পরিমার্জিত ছলনা।

আমায় দেখেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো,—"ওরে, তোর কথা আমি ভাবছি দু-দিন ধরে, এই মাত্র সুজাতাও বলছিলো।"

"কোথায় সুজাতাদি ?"

কাছেই এক বিখ্যাত অভিজাত সাহেবী দরজির দোকান। শুনলাম সুজাতাদি সেখানে ওভারকোটের ট্রায়াল দিচ্ছে।

অতনু বলে গেল, "আয় আমার সঙ্গে। তুই বরং অপেক্ষা কর এখানে, আমি মিনিট কুড়ির মধ্যে আসছি, আমার এক ইটালিয়ান বন্ধু ব্যাংকক চলে যাচ্ছে।"

সুজাতাদির নাম শুনে আমি বললাম, "আমি বরং কাল সকালে তোমার বাড়ি যাবো।"

"কেন রে একটু দাঁড়া না। আমি মিনিট কুড়ির মধ্যে আসছি।"

"আমার অন্য কাজ আছে," আমি বললাম, "কাল সকালে বাড়ি থাকবো।"

"কাল ? না কাল নয়। পরশু।"

"আচ্ছা।"

অতনু হাত নেড়ে ভেতরে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি সেই দরজির দোকানে গেলাম সুজাতাদির খোঁজ করতে, কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না।

পরে সুজাতাদির সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম। মনে হোলো, সে যেন একটু অবাক হয়েছে।

"ওভারকোটের ট্রায়াল দিতে গিয়েছিলাম ? কে বললে ?"

"অতনুদার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো গ্রেট ইস্টার্নের সামনে। সেই তো বললে।"

সুজাতাদি হেসে ফেললো, বললো, "তা হবে। তোমার বরাত খারাপ, সেখানে গিয়ে আমায় ধরতে পারলে না।"

চালাক মেয়ে সুজাতাদি, সেদিন বুঝতে পারিনি, পরে যেদিন অতনুদার সে সময়কার দিনগুলোর বিবরণ শুনছিলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে সে আমায় এড়ানোর জন্যেই ও কথা বলেছিলো। সুজাতাদি ছিলোই না সেখানে, কিন্তু আমার কাছে শুনে ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে সুজাতাদি আর আমার কাছে ভাঙেনি।

অতনু দুর্দম, এটা জানতাম, কিন্তু কোনো অসংযম তার মধ্যে আছে এটা ভাবতে পারতাম না। তাই এসব কথা শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। একবার ভাবলাম বলে দেবো সুজাতাদিকে, তারপর অনেক ভেবে নিজেকে সংবরণ করলাম।

কিন্তু কথাটা উঠে পড়লো।

আমি বোধহয় বলেছিলাম, "পর পর তিন চার দিন গিয়ে ওকে পাইনি।"

কি রকম একটা অদ্ভুত হাসি হাসলো সুজাতাদি। তারপর বললো, "কি করে পাবে? ওদের মতো লোককে সব সময় পাওয়া যায় না, মাঝে মাঝে ওরা নিখোঁজ হয়ে যায়, এমন কি নিজের কাছেও।"

আমি বুঝে গেলাম, একটু তাকিয়ে দেখলাম সুজাতাদিকে। তারপর বললাম, "তুমি জানো দেখছি।"

এবার সুজাতাদি অবাক হোলো,—"তুমি কি করে জানো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"শুনতে পেয়েছি।"

সুজাতাদি একটু চুপ করে রইলো। তারপর খুব স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললো, "দেখ, এ ধরনের সাধারণ ঘটনা থেকে অতনুর মতো লোকের সম্বন্ধে কোনো ধারণা করে নিতে নেই। এসব ওদের জীবনের একটা বাহ্য উচ্ছ্বাস।"

"কোনো মানে হয় না," আমি উত্তর দিলাম, "প্রয়োজন কি?

মনের গভীরতা থাকলে কি দৈনন্দিন জীবনের শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে কেউ ?"

সুজাতাদি হেসে বললো, "যারা খুব বড়ো আর্টিস্ট, ওদের জীবন-তৃষ্ণা এতো বেশী যে জীবনের বিভিন্ন অসম্ভাব্য পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ওদের যেতে হয়। কিন্তু ওরা কোথাও শেকড় গেড়ে বসে না। ওরা হচ্ছে প্রকৃতির মতো নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং তাদের সমস্ত রূপই অত্যন্ত সুন্দর। তাই প্রকৃতির মতো, তাদের মধ্যেও ঝড় ওঠে, আবার সেই ঝড় শান্ত হয়ে যায়। যে বড়ো শিল্পী, সে সাহিত্যিকই হোক, চিত্র-শিল্পীই হোক, সুরশিল্পীই হোক আর অভিনেতাই হোক,—আর দশজন সাধারণ লোকের মানদণ্ডে তার বিচার হয় না। সে ভাল কি খারাপ, নৈতিক কি অনৈতিক, সেটা বিচার্য নয়,—সে কি উঁচুদরের শিল্পী না নিচুদরের শিল্পী সেটাই বিচার্য। শিল্পী কোনোদিন চরিত্রহীন হয় না, তার শিল্পীসত্ত্বার একটি চরিত্র আছে, তাতে সে একনিষ্ঠ, সুতরাং সে চিরকালই চরিত্রবান।"

অতো বুঝবার মতো বয়েস তখন নয়, তাই আমাদের দেশের একজন মহৎ শিল্পীর নাম করে বলে উঠলাম, "তাঁর জীবনে কি কোনো অসংযম ছিলো, কোনো অনৈতিকতা ছিলো ?"

সুজাতাদি হাসলো, তারপর বললো, "দেখ, তোমার এ কথার উত্তর যে দিতে পারবো না তা নয়, যদি একটা দুটো কথা বলি তোমার চোখ কপালে উঠবে।"

সেদিন আর কিছু বুঝিনি, শুধু বুঝেছিলাম সুজাতাদি ভীষণ ভালোবাসে অতনুকে।

মনে মনে কিন্তু সুজাতাদির কথায় সায় দিতে পারি নি। শিল্পী সাধক। বিশ্বজীবনের যে অনন্ত সুন্দর রূপ নিহিত আছে তার চিরপরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনার মধ্যে, মনের সংযম ও শৃঙ্খলা

না থাকলে তার রসানুভূতি কি করে সম্ভব, এ প্রশ্নই বার বার মনে জাগছিলো।

একদিন সুজাতাদি হঠাৎ বললে, "তুমি নিজে গিয়ে একবার অতনুর খোঁজ গিয়ে এসো।"

ওর ঠিকানা নিয়ে নিলাম সুরজিতের কাছ থেকে। তারপর একদিন সকালবেলার ট্রেন ধরে বেরিয়ে পড়লাম অতনুর সন্ধানে।

একটি ছোটো স্টেশনে নেমে বাজার পেরিয়ে ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা কাঁচা পথ ধরে হেঁটে যেতে হয় মিনিট পনেরো কুড়ি। ভাঙা শিব মন্দিরের কাছে একটি ছোটো স্কুল। স্কুলের পাশেই থাকে স্কুলের হেডমাস্টার। একটি জীর্ণ একতলা কোঠাবাড়ি, তারই এককোণে একটি ঘরে থাকে অতনু।

ঘর খোলাই ছিলো। ঢুকে দেখি চারদিকে ছবি আঁকার সাজ-সরঞ্জাম ছড়ানো, একপাশে কয়েকটি ছবি। তিন চারটি তুলে দেখলাম, বেশির ভাগই ওয়াশ্, কিছু তেল-রঙের কাজ আছে। সবই ল্যাণ্ডস্কেপ্। স্নিগ্ধ, শান্ত সব দৃশ্য, নয়নাভিরাম রঙের বিন্যাস।

ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু পরে সুজাতাদিকে বলতে সে হঠাৎ রেগে উঠেছিলো। "বলেছিলো,—শুধু ল্যাণ্ডস্কেপ? গাঁয়ে গিয়ে অতনু আর কিছু আঁকবার পায় নি, শুধু ল্যাণ্ডস্কেপ? গাঁয়ে মানুষ বাস করে না? তাদের জীবনের ছবি আঁকছে না কেন?"

ছবি দেখে আমি অতোটা ভাবি নি। ল্যাণ্ডস্কেপ দেখেই আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

অতনু বাড়ি ছিল না। শুনলাম ছবি আঁকতে বেরিয়েছে। তাকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হোলো না। গাঁয়ের একটি ছেলে আমায় সঙ্গে করে ওর কাছে পৌঁছে দিলো।

একটি পুকুর পাড়ে ঈজেল দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকছিলো অতনু। আমায় দেখে খুব খুশি।

"আরে! তুই হঠাৎ কোত্থেকে? আমি সুরজিতের কাছে

তোর সব খবর পাই। আমি অনেক আগেই তোর প্রত্যাশা করছিলাম।"

আমি তখন অতনুর ছবিটা দেখছি। ধান ক্ষেতের ওপারে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। আকাশের মেঘে মেঘে নানা-রকম রং।

"কি ভাবছিস ?"

আমি একটু হেসে বললাম, "এ ধরনের জিনিস তো তুমি আঁকতে না। কিন্তু বক্তব্য থাকতো তোমার সব ছবিতেই।"

"এ ছবিতেও আছে", অতনু হাসলো।

"কি আছে ?"

"বক্তব্য।"

"কি বক্তব্য ?"

"ধান ক্ষেতের ওপারের সূর্যাস্ত খুব সুন্দর।"

আমি হেসে ফেললাম। "ব্যস'? শুধু এই ?"

"ছাখ, বক্তব্য মহৎ কি সাধারণ সেটা বড়ো কথা নয়, কতোখানি সার্থকভাবে তাকে প্রকাশ করলাম আমার ছবির মধ্যে সেটাই বড়ো কথা। এ ছবি কারো না কারো কাছে থাকবে। একটি সুন্দর সূর্যাস্ত যে তার জন্যে চিরকালের মতো ধরে রাখলাম, এটা কি কম কথা ?"

আমি উত্তর দিলাম, "দেখ অতনুদা, ছবি সুন্দর, কিন্তু এ আর এমন কি কথা ? গোপাল ঘোষ এ জিনিস অনেক করেছে। এই ছবি ওর চাইতে ভালো তুমি করতে পারবে না।"

অতনু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "ছাখ পরিমল, আমি এখানে ছবি আঁকতে আসি নি। সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি।"

ছুটি!—আমি একটু অবাক হলাম অতনুর কথা শুনে।

অতনু বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝলো। হেসে বললো,

"ছুটি নিয়েও কেন ছবি আঁকছি তাই ভেবে অবাক হচ্ছিস? আসল কথাটা কি জানিস? শহরের উদ্দাম গতিশীল জীবনে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। এখানে এলাম, যদি মানুষকে বাদ দিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে কিছু পাই।"

আমি হতাশ হলাম। মানুষকে বাদ দিয়ে জীবনকে উপলব্ধি করতে চাইছে একজন শিল্পী?

অতনু আমায় নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ওর কাছ থেকে ওর এখানকার দৈনন্দিন জীবনের ইতিবৃত্ত শুনছিলাম। সে এখানে মোটামুটি সুখেই আছে। কোনো ঝামেলা নেই। স্কুলের হেডমাস্টার হরিসাধনবাবুর সংসারে মাসে মাসে কিছু টাকা দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। ওঁর স্ত্রী ওর খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বাবধান করে। বাড়ির একজন হয়েই সে আছে।

হেডমাস্টার মশায়ের স্ত্রীকে দেখি নি। ওঁর বিধবা বোনকে দেখলাম। আমরা যখন ফিরে এলাম সে অতনুর ঘর গুছোচ্ছিলো। অতনু তাকে বললো, দুজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্যে।

মেয়েটির বয়েস বেশী নয়, চব্বিশ কি পঁচিশ হবে। শ্যামলা রং, সাধারণ চেহারা। সরু কালোপাড় শাড়ি পরনে, নিরাভরনা হলেও চেহারায় একটা স্নিগ্ধ আবেদন আছে।

"আমায় দাদা বলে ডাকে," বললো অতনু, "আমায় যত্ন করে খুব। বেচারী খুব অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছে। ভাসুরদের সংসারে আশ্রয় জোটেনি। তাই দাদার কাছে আছে।"

সারাদিন এমনি গল্প করে কাটালাম। নিজের কথা বেশী কিছু বললো না অতনু। শহরের চেনাজানাদের কথাও জিজ্ঞেস করলো না, বিকেলে আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এলো।

গাড়ি ছাড়বার একটু আগে বললো, "মাঝে মাঝে আসিস পরিমল।"

"কলকাতায় ফিরবে কবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

অতনু একটু হাসলো। তারপর উত্তর দিলো, "ফেরবার ইচ্ছে খুব নেই। এখানে বেশ আছি। হরিসাধনদাকে বলেছি স্কুলের ড্রয়িং মাস্টারের চাকরিটা আমায় দিতে। কলকাতায় ফিরে কি হবে?"

আমার কাছে অতনুর খবর শুনে সুজাতাদি হেসে খুন।

"কি বললে? গাঁয়ের স্কুলের ড্রয়িং মাস্টার? আমাদের অতনু?" সুজাতাদি হেসে গড়িয়ে পড়লো সোফার উপরে।

ও আগ্রহ প্রকাশ করলো হরিসাধনবাবুর ভগ্নীর সম্বন্ধে। "ওকে দাদা বলে ডাকে? ওর যত্ন করে খুব?" হাসতে লাগলো সুজাতাদি। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, "জানো পরিমল, এত সুখ অতনুর কপালে সইবে না। এই ভাগ্য নিয়ে সে আসেনি। দেখো, ও পালিয়ে আসবে একদিন।"

আর কিছু বললো না সুজাতাদি। কিছুক্ষণ আনমনে কি যেন ভাবলো, তারপর হঠাৎ বললো, "চলো পরিমল, একটা সিনেমা দেখে আসি। মেট্রোতে একটা ভালো বই এসেছে।"

ইচ্ছে থাকলেও অতনুর কাছে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সুরজিত প্রায়ই যেতো। কেতকীও যেতো মাঝে মাঝে, ওদের কাছে শুনতাম অতনুর কথা। বিশেষ কিছু নয়, সে ভালোই আছে, স্কুলে ছবি আঁকা শেখায়, অবসর সময় নিজে ছবি আঁকে, তাও বেশী নয়। কলকাতার এক পাবলিসিটি ফার্ম ওকে চাকরি দিতে চেয়েছিলো। ভালো মাইনে, কিন্তু সে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ছয়

বোধহয় আট নয় মাস কেটে গেল। ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পার হয়ে আষাঢ়ে পড়লো।

ইতিমধ্যে কখন অতনু মজুমদার আবার কলকাতায় ফিরে এলো জানতে পারিনি। সুজাতাদি ওর বাবার সঙ্গে কাশ্মীরে গিয়েছিলো। সুরজিত আর কেতকীর সঙ্গেও দেখা হয়নি বেশ কিছুদিন।

একদিন কাগজে দেখলাম পার্ক স্ট্রীটে আবার অতনু মজুমদারের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। চিত্র সমালোচনায় পড়লাম যে, শিল্পী এবার নতুন ধরনের ছবি এঁকেছে। একেবারে বদলে ফেলেছে তার টেকনিক ও মিডিয়াম। তুলির কাজ নাকি আগের চাইতে অনেক বলিষ্ঠ।

সেদিনই দেখতে গেলাম অতনু মজুমদারের চিত্র প্রদর্শনী। দেখলাম, বেশির ভাগই ওয়াশের কাজ। বেশির ভাগই ল্যাণ্ডস্কেপ, কিছু গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র, কিছু পশুপাখির স্কেচ।

ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি বুঝতে অসুবিধে হয় না। ছবির সঙ্গে চিত্র-তালিকার ক্যাপশানের অসঙ্গতি পাওয়া যায় না। রঙের কাজ অনেক সূক্ষ্ম ও কোমল, আগেকার মডার্নিস্ট ছবির মতো উগ্র নয়। দেখলাম, প্রায় প্রত্যেক ছবির নিচেই কারো না কারো নামে কাগজ আঁটা। খুব ছবি বিক্রি হয়েছে এবার।

তিনটে ঘর ভরা অতনুর ছবি। ঘুরে ঘুরে দেখলাম ছবিগুলো। দর্শকের ভিড়ও হয়েছে বেশ। কিন্তু শিল্পীকে দেখতে পাওয়া গেল না কোথাও। প্রদর্শনীর তদারক করছে সুরজিত আর কেতকী।

"এবারের ছবি কি রকম লাগছে," সুরজিত আমায় জিজ্ঞেস করলো।

আমার খুব ভালো লাগেনি। সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। আমি একটু হতাশ হয়েছিলাম। তবে চারদিকে সবার মুগ্ধ মুখের ভাব দেখে আর প্রশংসাবাদ শুনে নিজের বিচারবুদ্ধির উপর সন্দেহ জন্মাচ্ছিলো।

সুরজিত খুব ব্যস্ত। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলবার সময় তার নেই। সে চলে গেল অন্য দিকে।

কেতকী আমায় দেখে কাছে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, "আপনার ভালো লাগছে এসব ছবি ?"

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, "নেচার-স্টাডি হিসেবে ছবিগুলি মন্দ নয়, বেশ ভালো, ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে ঘরের শোভাবৃদ্ধি করা যায়। কাউকে ছবির অন্তর্নিহিত অর্থ বলার চেষ্টা করতে হয় না, কেউ কোনো কৈফিয়ত তলব করে না। দেখতেই তো পাচ্ছো, বেশ ছবি বিক্রি হচ্ছে।"

কেতকী একটু হাসলো।

"তোমার কি রকম লাগছে বলো ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ভালো লাগেনি।"

"কেন ?"

কেতকী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "কি জানি, আমি বুঝি না। এসব ছবিতে চোখ ভরে, মন ভরে না। যে ছবি আঁকতে চাই, শহরের এখনকার জীবনের মধ্যে থেকে সে ছবি আঁকতে পারছি না বলে, এই জীবন-পরিবেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে সমস্যাবিহীন জীবনের উপলব্ধিবিহীন কতকগুলো চোখে-ভালো-লাগা জলরঙ ছবি আঁকবার চেষ্টা করলেই সে সব ছবি হয় না। পলাতক মন নিয়ে কোন শিল্পী বড়ো কাজ করতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে এসব ছবি একেবারে ফাঁকি।"

আমি একটু হাসলাম কেতকীর কথা শুনে।

"অতো বড়ো কথা বললে অতনুর ছবি সম্বন্ধে?"

"কেন বলবো না? ড্রয়িংরুম সাজানোর জন্যে এ ছবি খুব ভালো, কিন্তু এর বক্তব্য কি? ভাবীকালের কাছে এই ছবি কি জানাবে?"

আমি কেতকীর কথা যতো না শুনছিলাম, তার চাইতে বেশি দেখছিলাম ওর চোখ দুটো। ওর চোখ ভরে এত হতাশা কেন?

কেতকী বলে গেল, "অতনুদা যে নিজেও একথা বোঝে না তা নয়। তাই খুব বেশীদিন ওই অজ পাড়াগাঁয়ে টিকতে পারেনি।"

"সত্যি, গাঁয়ে বসে কি ছবি আঁকবে সে? ওর মতো আর্টিস্টের জন্যে পাড়াগাঁ নয়," আমি বললাম।

কেতকী সায় দিলো না আমার কথায়। বললো, "সে কথা মানবো না। আর্টিস্টের ক্ষেত্র সর্বত্র। কেন, ওখানে কি ছবি আঁকবার বিষয়বস্তু নেই? প্রচুর আছে। কিন্তু মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করলে যে রকম শুধু পদ্য হয়, কবিতা হয় না, ছবির বেলায়ও তাই। সেজন্যে কিছুদিনের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠে এখানে পালিয়ে এসেছে অতনুদা।"

"ও কোথায়?"

"কি জানি কোথায়। এসব ছবি এঁকে ওঁর ভালো লাগেনি বলে ওখানে টিকতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ওঁর ফিরে আসা অবধি দেখেছি ছটফট করছেন, কতক্ষণে এই ছবিগুলো চোখের সামনে থেকে দূর করা যায়। বলছেন, যেগুলো বিক্রি হবে না, সব বিলিয়ে দেবেন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে একজিবিশান করলো কেন?"

"টাকা তো চাই," বলে কেতকী হাসলো। "আগের বার এত ছবি বিক্রি হয়নি, কারণ ওসব ছবি কেউ কেনেওনি, সত্যি সত্যি কারো ভালোও লাগেনি।"

আমি একটু হেসে বললাম, "ওরকম হয়। ভালো ছবি বুঝতে সময় নেয়।"

প্যারিসে আঠারোশো তেষট্টির সরকারী সালোঁতে সেজান, হুইসলার, মানেৎ—এদের ছবি নেওয়া হয় নি। ওরা তাই একটি আলাদা প্রদর্শনী করেছিলো,—আর্টের ইতিহাসের সেই বিখ্যাত প্রত্যাখ্যাত শিল্পীদের প্রদর্শনী। সারা প্যারিসের লোক ঠাট্টা তামাসা করেছিলো সেই প্রদর্শনীর ছবি নিয়ে।

সেই প্রদর্শনীর সবচেয়ে নিন্দিত ছবি ছিলো মানেৎ-এর "লাঞ্চন্ অন্ দি গ্রাস"। আজ সে ছবি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি বলে স্বীকৃত হয়েছে।

তেমনি, ভ্যানগগ যদ্দিন বেঁচেছিলো, একটির বেশী ছবি বিক্রি করতে পারে নি। গোর্গ্যাকে প্রচুর তাচ্ছিল্য সইতে হয়েছে, স্যালভাডর ডালি বা ম্যাক্স্ আর্নস্ট্কে আজো বেশী লোক বুঝতে পারে না। অজন্তার চিত্ররীতির পুণর্প্রবর্তন করে আমাদের শিল্প-গুরুদের যথেষ্ট বিদ্রূপ সইতে হয়েছে প্রথম দিকে। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে এখনো অনেকে আস্তিনের আড়ালে মুখ লুকিয়ে হাসে। আর্টের ইতিহাসে প্রত্যেক সার্থক শিল্পীকে এই দাম দিতে হয়েছে। সমসাময়িক চিত্রকলা সমসাময়িক দর্শকসাধারণ কোনোকালেই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেয় নি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে আর্টিস্ট্রি হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম। পার্ক স্ট্রীটের উপর এসে হঠাৎ দেখি, রাস্তার ওপারে অতনু দাঁড়িয়ে গল্প করছে সুজাতাদির সঙ্গে।

আমার একটু রাগ হোলো।

সুজাতাদি কলকাতায় ফিরেছে, কিন্তু আমায় খবর দেয় নি?

আমি ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, ওরা একটি ট্যাক্সি ডাকলো।

ওদের নিয়ে ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল আমারই পাশ দিয়ে

কয়েকদিন পরে অতনুর বাড়ি গিয়ে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে। তারপর আরও ছু-একদিন গিয়ে দেখলাম অতনু বাড়ি নেই।

কেতকীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার বলো তো।"

সে তখন রজনীগন্ধার একটি আঁকাবাঁকা ডাঁটি আর ছুটো লম্বা পাতা পিন-হোল্ডারে লাগাচ্ছিলো এক বিচিত্র সুন্দর ছাঁদে। উত্তর দিলো, "অতনুদা কিছুদিন ছবি আঁকবে না।"

দেখলাম, ওর মুখ খুব ছায়াঘন হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, "কেন ছবি আঁকবে না অতনুদা?"

"সুজাতাদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন", কেতকী বললো পুষ্প-বিন্যাস করতে করতে, "সে বলতে পারবে বোধ হয়।"

শুধু একথা জানবার জন্যে সুজাতাদির বাড়ি যাওয়া যায় না। ও কলকাতায় ফিরে আর খবর দেয় নি বলে আমি নিজেও আর ওর খবর নিই নি।

কিন্তু বেশীদিন অপেক্ষা করতে হোলো না। দিন তিন-চার পর সুজাতা নিজেই আমার বাড়ি এলো।

বাড়িতে বসে খানিকক্ষণ গল্প করলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম, সুজাতাদি কি সব যেন কেনাকাটা করবে গড়িয়াহাটের মোড়ে। বাস-স্টপে এসে কথায় কথায় বললাম, "অতনুদার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। ওর বাড়ি কয়েকবার গিয়ে ফিরে এসেছি। সেখানে নাকি আজকাল থাকেই না বড়ো একটা। সেদিন কে যেন বলছিলো, ও আর ছবি আঁকবে না কিছুদিন।"

সুজাতাদির মুখ একটু যেন ঝলমল করে উঠলো। বললো, "আঁকবে। তবে এখন নয়। বিয়ের পর আঁকবে। ঘর সংসার না

করলে নাকি সত্যিকারের ছবি আঁকবার প্রেরণা আসবে না। ওর এই ধারণা হয়েছে আজকাল।”

“কথাটা হয়তো সত্যি”, আমি বললাম।

“সত্যি না আরো কিছু”, সুজাতাদি উত্তর দিলো, “ঘর সংসার লোকে ঘর-সংসার করবার জন্যেই করে, নিজের কাজের প্রেরণার একটি রিজার্ভ-ফাণ্ড তৈরী করবার জন্যে নয়। জীবনে কিছু বড়ো কাজ করবার জন্যেই শুধু বিয়ে করা,—এই ধারণা নিয়ে বিয়ে করতে না যাওয়াই ভালো।”

“কাকে বিয়ে করছে অতনুদা ?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন ছিল না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সুজাতাদির মুখ একটু লাল হোলো।

সেও কোনো উত্তর দিলো না।

সুজাতা বিয়ে করছে অতনুকে !—আক্ষেপ করতে লাগলো সুজাতার চেনাশোনারা। ওর চাল নেই, চুলো নেই…।

বুদ্ধিমান মেয়েরা বিয়ে করবার সময় কী ভীষণ বোকামি করে ফেলে মাঝে মাঝে,—বলতে লাগলো অনেকেই।

এ খবর শুনে খুশি হয়েছে, এমন একজনকেও দেখলাম না। যারা সুজাতার হিতৈষী তাদের দুঃখ হোলো এই ভেবে যে, সুজাতা স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে, একজন অব্যবস্থিতচিত্ত শিল্পীর সঙ্গে সংসার করতে গিয়ে সে শুধু কষ্টই পাবে, এবং তার ফলে তাদের বিবাহিত জীবন সুখী নাও হতে পারে। যারা অতনুর বন্ধু, তারা ভাবলো সুজাতাকে বিয়ে করলে অতনুকে জীবনযাত্রায় যে মান বজায় রাখতে হবে, তাতে চাকরি না করে তার উপায় থাকবে না। ভালো চাকরি যোগাড় করা অতনুর পক্ষে দুঃসাধ্য নয়, কারণ, কলকাতায় ভালো কমার্শিয়্যাল আর্টিস্টের কদর হতে শুরু হয়েছে সে সময়, বিশেষ করে বিদেশী পাবলিসিটি ফার্মে। কিন্তু চাকরি করতে গেলে সে আর ছবি আঁকতে

পারবে না আগের মতো, চিত্রকলার দুঃসাহসিক অংকনরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার প্রেরণা তার মধ্যে আর থাকবে না, রুটিন-বাঁধা জীবনযাত্রার মধ্যে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে তার শিল্পীসত্তা।

কোনো পক্ষের সঙ্গে একমত হলাম না আমি। তবু যেন মনে হোলো আমার মনও খুশি নয়। ভেবে দেখবার চেষ্টা করতে গিয়ে থেমে গেলাম। নিজের মনকে বিশ্লেষণ করবার সাহস আমার রইলো না। শুধু সুজাতাদির কাছে যাওয়া আসা কমিয়ে দিলাম।

"তোদের একটা অদ্ভুত ধারণা আছে আমার সম্বন্ধে," অতনু একদিন বলছিলো আমায়, "তোরা মনে করিস আমি কোথাও টিঁকে থাকতে পারি না।"

কথাটা উঠেছিলো অতনুর একটা পরিকল্পনা নিয়ে। ও বলছিলো, সবার পক্ষে আর্ট স্কুলে পড়ে ছবি আঁকতে শেখা সম্ভব নয়, অথচ বড়ো দরের শিল্পীর কাছে ছবি আঁকা শিখবে, সে সুযোগও সবার নেই, তাই সে ঠিক করছে নিজের স্টুডিওতে সে হপ্তায় দু-দিন কি তিন-দিন ছবি আঁকা শেখানোর ক্লাস খুলবে।

ওর কথা শুনে আমি বললাম,—"ধৈর্য থাকবে তো শেষ পর্যন্ত ?"

অতনু হাসলো।

আমি বলে গেলাম,—"তুমি না বলেছিলে গাঁয়েই স্থায়ীভাবে বসবাস করবে, গাঁয়ের স্কুলে ড্রয়িং মাস্টারের চাকরি নেবে, পল্লীজীবনের ছবি আঁকবে। চলে তো এলে দু-দিন যেতে না যেতেই।"

"গাঁয়ে ছবি আঁকবার বেশী কিছু নেই," আস্তে আস্তে বললো অতনু, "তাই কয়েকটা ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকেই হাঁপিয়ে উঠলাম।"

"আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবন জানতে হলে গাঁয়ে যেতে হয়।"

অতনু একটু চুপ করে থেকে বললো, "ছাখ, মানুষের জীবন শুধু একটা সংখ্যাতাত্ত্বিক সত্য নয় যে দশজন লোকের মধ্যে নয়জন

একটা বাঁধাধরা গতানুগতিক জীবনযাপন করছে দেখলে সেটাকেই জীবনের একটা চিরন্তন রূপ বলে মেনে নেবো। এ হাল চাষ করছে, আর ও পুকুর থেকে জল তুলছে, তুলি ও রং দিয়ে শুধু এসব রেকর্ড করে রাখবার জন্যে আমি শিল্পী হইনি। আমরা একটা আশ্চর্য শতাব্দীর মধ্যে বাস করছি। পৃথিবী ইতিহাস বদলাচ্ছে, মানুষের ধ্যান ধারণা পাল্টে যাচ্ছে, মানুষ একদিকে নতুন জীবনের স্বপ্ন, অন্য-দিকে জান কবুল করে টিঁকে থাকবার অদম্য প্রয়াস বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক সংঘাতের মধ্যে। এই জীবন-সংগ্রামের রূপ যদি ছবিতে ধরতে না পারলাম তো এ যুগের শিল্পী হয়ে জন্মালাম কেন?"

আমি জানতে চেয়েছিলাম, এই জীবনসংগ্রাম গাঁয়ের মানুষের মধ্যে নেই?

আছে,—অতনু উত্তর দিয়েছিলো,—তবে খুব ইতিহাস-সচেতন ভাবে নয়, যা আছে সে শুধু ব্যক্তিগত পারিবারিক সীমানার মধ্যে। শতাব্দীকাল ধরে জীবন সংগ্রামের যে রূপ, আজো তাই আছে। তাই যদি আঁকলাম তো সেটা এ যুগের ছবি হোলো কোথায়, সে তো দুশো বছর আগেকার ছবিও হতে পারে, তফাত যেটুকু সে শুধু অংকন-রীতির। যুগমানসকে ছবির মধ্যে পাচ্ছি কোথায়?

অতনুর সঙ্গে একমত হলাম না, কিন্তু তর্ক করতে ইচ্ছে করলো না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম,—"কোথায় বসে আঁকলে যুগমানসের সন্ধান পাবে?"

আমার কথার সুরে একটু ঠাট্টা ছিলো, কিন্তু অতনু গায়ে মাখলো না। আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "জানিনা। যেদিন জানবো, সেদিন সত্যিকারের ছবি আঁকতে পারবো।"

জানতে চেয়েছিলাম, এজন্যেই কি শহরে ফিরে এলো অতনু?

"এক রকম তাই", অতনু বললো, "তবে একটা উপলক্ষও

ছিলো।” বেশী কথার মানুষ সে নয়। বললো অল্প দু-চার কথায়।

স্কুলের হেডমাস্টার হরিসাধনবাবুর বোন অন্নপূর্ণাই অতনুর দেখা-শোনা করতো। তার ঘর গুছিয়ে দিতো, খাওয়ার ঠাঁই করে দিতো, ফরমাস মতন চা পরিবেশন করতো। খাবার পরিবেশন করতো হরিসাধনবাবুর স্ত্রী যমুনা। ওঁর রসনা ছিলো ক্ষুরধার, চাবুকের মতো জর্জরিত করতো সবাইকে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে দেখা গেল রান্নায় যমুনার একটা নতুন আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকদিনই একটা না একটা কিছু নতুন ধরনের তরকারি, উপকরণ খুব সাধারণ হলেও রান্নার গুণে অমৃতের মতো তার স্বাদ। যমুনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অতনুকে জিজ্ঞেস করতো রান্না কি রকম হয়েছে, অতনুর মুখে বার বার রান্নার প্রশংসা শুনেও যেন তৃপ্ত হোতো না।

খাওয়ার সময় কিন্তু কাছে বসে থাকতো অন্নপূর্ণা। তাকে অতনু একদিন এমনি বললো,—তোমার জন্যে আজ কি রেঁধেছো?

বিশেষ কিছু না,—বললো অন্নপূর্ণা—শুধু মুলো আর আদাবাটা দিয়ে মুগের ডাল।

এখন, মুগের ডাল ছিলো অতনুর খুব প্রিয়। শুনেই তার জিভে জল এলো। বললো,—তাই নাকি, একটু আনো তো, চেখে দেখি!

অনেক ইতস্তত করে অন্নপূর্ণা বাটি ভরে মুগের ডাল নিয়ে এলো। খুব সাধারণ রান্না, কিন্তু খুব তৃপ্তি ভরে খেলো অতনু। মাছের ঝোল নিয়ে আসছিলো যমুনা, হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

তারপর তিন চার দিন ধরে দেখা গেল সামান্য ব্যাপারে অন্নপূর্ণাকে কথায় কথায় খোঁটা দিচ্ছে যমুনা। অতনু হয়তো অতটা লক্ষ্য করতো না। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলো, নিরামিষ কিছু আছে কিনা। অন্নপূর্ণা মাথা নেড়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো, কিন্তু অতনুর কাছে গোপন করতে পারলো না তার উদ্গত অশ্রু।

অতনু কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল।

দিন-দুয়েক পর একটি নতুন মেয়েকে দেখা গেল হরিসাধনবাবুর বাড়িতে। হঠাৎ তাকে অতনুর ঘর ঝাড়পোঁছ করতে দেখে অতনু একটু অবাক হোলো, যমুনাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—এ আবার কে?—যমুনা হেসে জানালো, সে তার ছোটো বোন মলিনা, কয়েকদিন এখানেই থাকবে। খাওয়ার সময় অতনু দেখলো সে-ই পরিবেশন করছে যমুনার নির্দেশে।

অন্নপূর্ণাকে ধারে কাছে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

অতনু হাঁপিয়ে উঠলো। সকালে চা এনে দিচ্ছে মলিনা, খাওয়ার পর পান এনে দিচ্ছে মলিনা, সময়ে অসময়ে এসে চা লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করছে, ধোয়া কাপড় শুকোতে দিচ্ছে, শুকনো কাপড় পাট করে তুলে রাখছে, রাত্তিরে দুধের বাটি নিয়ে আসছে, বিছানার চাদর ঝেড়ে পুঁছে দিচ্ছে—আর মুখ টিপে টিপে হাসছে সব সময়। এসব কাজ অন্নপূর্ণাও করতো, কিন্তু এত নিঃশব্দে যে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে অতনুর একটুও অবহিত হওয়ার প্রয়োজন হোতো না। কিন্তু মলিনা যেন তার চালচলনে, হাসিতে চাউনিতে সব সময় ঘোষণা করতো তার উপস্থিতি।

অতনু মনে মনে বিরক্ত হলেও ভাবলো, যাই হোক, চলে তো যাবে দু-পনেরদিন পরে। সুতরাং কিছু না বলাই ভালো।

অতি কষ্টে প্রায় এক মাস কাটলো। এর মধ্যে সে অন্নপূর্ণাকে কাছাকাছি বড়ো একটা দেখতে পায়নি। দূর থেকে দেখতে পেতো মাঝে মাঝে, চিরাচরিত ভাবে ঘর-সংসারের কাজ কর্ম করছে। কাছে আসতো না, আগের থেকেই সরে যেতো।

একদিন পেছন দিকের উঠোনে তাকে একলা পেয়ে অতনু জিজ্ঞেস করলে,—কী ব্যাপার, আজকাল যে আমার ঘরে আসোই না একেবারে।

এমনি, সংসারের নানা কাজে আর সময় হয় না। মলিনা তো আছে, আপনার কি চাই না-চাই সে-ই এসে বলে,—ম্লান হাসি হেসে চলে গেল অন্নপূর্ণা।

সেদিন অতনু ছবি আঁকতে গিয়েছিলো ধানক্ষেতের ওদিকে। ছবি আঁকতে গিয়ে আনমনা হয়ে গেল বার বার।

দুপুরবেলা হঠাৎ মনে পড়লো যে তার স্কেচ-বুকটা বাড়িতে ফেলে এসেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলো। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে থমকে দাঁড়ালো।

তার বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে অন্নপূর্ণা।

সে অতনুকে দেখতে পায়নি। অতনু যেমনি এসেছিলো তেমনি চলে গেল নিঃশব্দে।

কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরবার পর তার জন্যে চা নিয়ে এলো যমুনা নিজে। অতনুর নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে, নিজের পিত্রালয়ের গুণকীর্তন, মলিনার বহুবিধ প্রশংসা করে তারপর বললো,—ওর জন্যে ছেলে খোঁজা হচ্ছে অনেকদিন থেকে, কিন্তু ও তো আমাদের সবার ছোটো, তাকে তো যেখানে সেখানে দেওয়া যায় না, তাই আমার মা-বাবার পছন্দ হচ্ছে না কোথাও। ওঁদের ধারণা, ভালো ছেলে আজকাল পাওয়া খুব শক্ত। ভালো ছেলে দেখা যায় না বড়ো একটা। তবে আপনাকে দেখলে ওঁদের সে ধারণা নিশ্চয়ই পাল্টাবে।

যমুনার কথা শুনে অতনু মনে মনে চমকে উঠলো। কোনো উত্তর দিলো না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে যমুনা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, মলিনাকে পছন্দ হয়?

অতনুর মুখে একটা খুব রূঢ় উত্তর এলো। কিন্তু নিজেকে সামলে যথাসম্ভব ভদ্রভাবে বললো,—আমি নিষ্কর্মা ভবঘুরে আর্টিস্ট, আমার বিষয়ে এরকম চিন্তা না করাই ভালো।

সেদিন রাত্তিরেই অতনু মনস্থির করে ফেললো। নাঃ, এখানে আর নয়, এখান থেকে সরে পড়তে হবে। এসব ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়বার জন্যে তো সে আসে নি।

তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেললো তার পরদিনই।

যাওয়ার একটু আগে তার জন্যে পান নিয়ে ঘরে ঢুকলো যমুনা নিজেই। খুব যত্নে সাজা পান, খেয়ে অতনু তারিফ না করে পারলো না। কিন্তু প্রশংসা শুনে যমুনার মুখে এমন কিছু আনন্দের ঝিলি-মিলি দেখা গেল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, সত্যি চলে যাচ্ছেন ?

অতনু হাসলো, বললো, অনেকদিন তো কাটালাম। আর কদ্দিন ? এবার তো ফিরে যেতে হবে।

আমি ভেবেছিলাম, আপনি এখানেই থেকে যাবেন।

সে হয় না বৌদি, অতনু উত্তর দিলো, আমাদের মতো লোক এখানে টিঁকে থাকতে পারবে না।

যমুনা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো একটু হেসে, আমার রান্না খেয়েও নয় ?

অতনু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

যমুনা আস্তে আস্তে বললো, জানেন, আমি খুব ভাল রাঁধতে পারি ; এ আমার একটা মস্ত শখ। কিন্তু এখানে বিয়ে হয়ে অবধি রেঁধে তৃপ্তি পাই নি। এদের খুব ভালো রেঁধে খাওয়ানো যা, আলুসেদ্ধ-ভাতে খাওয়ানোও তা। এদের খাওয়া শুধু পেট-ভরানোর জন্যে। আপনাকে খাইয়ে আনন্দ পেতাম। আপনার রুচি আছে। তরকারি একটু চেখেই আপনার চোখেমুখে যে ভাব ফুটে উঠতো, শুধু সেটা দেখবার জন্যে আমি সারাজীবন আপনার বাড়িতে রাঁধুনী হয়ে থাকতে রাজী আছি। ভেবেছিলাম, এই রান্না খাইয়ে আমি এই বনগাঁয়ে ধরে রাখতে পারবো, অনেক আশা

করেছিলাম, মলিনাকেও আনিয়েছিলাম,—কিন্তু দুনিয়ায় কে কার। বলতে বলতে যমুনার গলা ধরে এলো।

চলে যাওয়ার সময় হরিসাধনবাবুর ছোটো ছেলে নান্তু এসে লুকিয়ে একটা মোড়ক দিলো অতনুকে। বললো,—পিসী দিয়েছে, বলেছে আর কাউকে না দেখাতে।—অতনু খুলে দেখে, রঙীন সুতোর ফুল পাতার নক্‌সা করা একটি বালিশের খোল।

অন্নপূর্ণা কিন্তু দেখা করতে এলো না একবারও।

অল্প কথায় এই ইতিহাস শুনিয়ে অতনু আমায় বললো হাসতে হাসতে, "ভেবে দেখ, কী বাঁচা বেঁচে গেছি। একদিকে মলিনা, অন্যদিকে অন্নপূর্ণা, তারপর যমুনা-বৌদি। সে আবার আর্টিস্ট, রান্না তার কাছে আমার ছবির মতোই একটি শিল্পকলা, কিন্তু বেচারী! অনেক আর্টিস্টের মতো সেও জানে না যে, আর্ট কাউকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে নয়।"

"তা হলে এই তোমার সেখান থেকে পালিয়ে আসার ইতিহাস," আমি একটু আনমনে আস্তে আস্তে বললাম।

"হ্যাঁ ভাই, আমি সেখানে ছবি আঁকবার জন্যেই গিয়েছিলাম, জড়িয়ে পড়বার জন্যে নয়। যাই হোক, অনেক ছবি হয়ে গেল, এখানে একজিবিশান হোলো, ছবি বিক্রি হোলো, কিছু পয়সা পেলাম, —এটুকুই আমার লাভ।"

"আর লোকসানটা কি?"

একটু ভেবে অতনু বললো, "যে জিনিসের সন্ধানে সেখানে গিয়েছিলাম, যা আমায় প্রেরণা দেবে নতুন ছবি আঁকবার, তার জন্যে যে অনর্থক এত সময় সেখানে নষ্ট হলো, সেটাই লোকসান।"

কি জানি কেন, হঠাৎ মনে হোলো, অতনুদা দক্ষ শিল্পী হতে পারে, কিন্তু এখনো ওর চোখ ফোটে নি।

আমার ধারণা ছিলো অতনু সুজাতাদিকে অন্নপূর্ণা বা যমুনার কথা

কিছু বলে নি, তাই আমি নিজেও জানাই নি, কিন্তু একদিন দেখলাম, সুজাতাদি জানে অন্নপূর্ণার কথা।

সে বলছিলো, "আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকেই বলছে, বিয়ের ঠিক হয়েছে, খুবই ভালো কথা, কিন্তু এমন কি তাড়া? আরো কিছুদিন যাক, অতনুর একটা স্থিতি হোক, তারপর একসময় হলেই হয়।"

আমি উত্তর দিলাম, "এমন কিছু যে ভুল বলছে, তা তো মনে হয় না। ওর কি কোনো মতিস্থিরতা আছে।"

সুজাতাদি হাসলো, "ছ্যাখো পরিমল, মতিস্থিরতা যদি থাকবে তো সে আর্টিস্ট হয়ে জন্মেছে কেন। এমন লোককে শেকল-ছাড়া হয়ে থাকতে দিতে নেই। একমনে নিজের কাজও করতে পারবে না, পরেরও ক্ষতি করে বেড়াবে।"

"কার আবার ক্ষতি করলো?"

সুজাতাদি একটু ভাবলো। তারপর বললো, "দেখ অতনুকে বোলো না যে তোমায় আমি বলেছি। ও একটি বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলো।"

"অন্নপূর্ণাকে?"

"তোমায় বলেছে না কি!"

"না, ওসব কথা বলে নি। তবে আমি যখন ওর ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, ওকে দেখেছি।"

"হ্যাঁ, তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে ঠিক করেছিলো।"

শুনে আমি চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, "তাই যদি করতো তো কাজটা এমন কি অন্যায় হোতো তা তো আমি বুঝতে পারছি না।"

সুজাতাদি একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, "কিছু অন্যায় হোতো না যদি তাদের মধ্যে একটা সত্যিকারের ভালোবাসা থাকতো।"

"ভালোবাসা যদি না থাকবে তো অতনু তাকে বিয়ে করবার কথা ভাববে কেন?"

"করুণা করে—।"

"শুধু করুণা ?"

"তা ছাড়া আবার কি ? একদিন ওকে তার ঘরে বসে কাঁদতে দেখেছে, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে করুণা-বিগলিত হয়ে তাকে বলেছে,—হ্যাঁ গো, তোমার জীবনে এত দুঃখু আমায় বলোনি কেন ? আমার জন্যে যদি সব কিছু ছাড়তে রাজী হও তো চলো আমার সঙ্গে। কাউকে কিছু না বলে আমরা চলে যাই।"

"ব্যস্ ? এই এক কথাতেই অন্নপূর্ণা রাজী ? ভালোবাসা না থাকলে অনাত্মীয়-পুরুষের এক কথায় ভদ্র ঘরের একটি মেয়ে তার হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে ?"

সুজাতাদি হাসলো। বললো, "ভুলে যাচ্ছো কেন, মেয়েটি বিধবা, স্বামীর সংসারে কিছুই পায় নি, দাদার সংসারে কিছু পাবার আশা করে না। জীবনে সে অন্য কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে আসে নি, প্রথম যার সংস্পর্শে এসেছে, তারই সঙ্গে ঘর করবার স্বপ্ন দেখেছে মনে মনে।"

"এই ভালোবাসার মধ্যে অন্যায়টা কি ? সে ঘর চায়, অতনু যদি তাকে সেই আশ্রয় দিতে পারে—,"

সুজাতাদি আমার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো, "ভালোবাসা ? আমি তো ভালোবাসার কথা বলি নি। ঘর করবার ইচ্ছে হওয়াটাই ভালোবাসা ? অতনু আর্টিস্ট, অন্নপূর্ণার মতো একটি সামান্য মেয়ে তাকে কি বুঝবে, কি করতে পারবে তার জন্যে ? আমি যদি মাঝখানে গিয়ে না পড়তাম, তাহলে কি হোতো জানো ? অতনু হয়তো বিয়ে করতো তাকে, কিন্তু কিছুদিন পরে তার একঘেয়ে লাগতো, হাঁফিয়ে উঠতো সে। কি পেতো তার মধ্যে ? হয়তো পালিয়েই যেতো। সে আর্টিস্ট, তার মনে কি দয়া মায়া আছে ? শুধু করুণার উপর ভিত্তি করে ঘরকন্না হয় না। বেচারী অন্নপূর্ণা সারাজীবন কেঁদে কেঁদে সারা হোতো।"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম সুজাতাদির কথা। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি মাঝখানে গিয়ে পড়লে কিরকম?"

সুজাতাদি মুখ নিচু করে একটু হাসলো। বললো, "আমি একদিন ওখানে গিয়েছিলাম।"

"সেই গাঁয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"কার সঙ্গে?"

"একলা।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি। দেখলাম, অতনু কিরকম বদলে গেছে। এখানে কি মেজাজ ছিলো তার, ওখানে গিয়ে একেবারে নিরামিষ বনে গেছে। অন্নপূর্ণাকে দেখেই আমি আঁচ করলাম যে একটা কিছু ব্যাপার আছে এখানে। আমার মেয়ের চোখ। আমায় ফাঁকি দেবে অতনু? আমায় দেখে অন্নপূর্ণাও বুঝলো। তার কামনা তো আর আমার ভালোবাসার মতো জোরদার নয়। সে অমনি অভিমান করলো, আর বেরোলো না অতনুর সামনে। অতনুর মনেও তো তেমন কিছু ভালোবাসা নেই ওর জন্যে যে সব কাজ ছেড়ে ওর মান ভাঙাতে বসবে। একটু দুঃখিত হোলো, ব্যস, ওই পর্যন্ত। আমি ওর ছবি দেখে বললাম, একেবারে যাচ্ছেতাই। অতনুর কাছে এসব ছবি আশা করি না। গাঁয়ে বসে নিরামিষ জীবন-যাপন করলে এবং শরৎ চাটুজ্যে-মার্কা ভাবপ্রবণ প্রেম করলে এই হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেবিট দিয়ে ওর নাম পাল্টে জনার্দন কি ভজহরি এরকম একটা কিছু নাম রাখা উচিত। ওর অতনু নামটা জন্তু বিশেষের গলায় মুক্তার হারের মতো মনে হচ্ছে।—এসব কথা শুনে আর্টিস্টের আত্মসম্মানে বাধলো। টেবিল চাপড়ে বললো, এসব ছবি পেলে লোকে দেদার টাকা দিয়ে কিনবে। আমি বললাম, অতো আস্ফালন না করে কলকাতায় একজিবিশান করে দেখিয়ে

দাও। যদি ওর একটি ছবিও বিক্রি হয়, আমি নাম পাল্টে ফেলবো। ব্যস, ও তিন-চারদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এলো একজিবিশান করতে। আর্টিস্ট আর কাকে বলে?"

আমি হেসে ফেললাম। "ছবি বিক্রি তো হয়েছে খুব। তোমার না নাম পাল্টে ফেলার কথা?"

সুজাতাদির মুখ একটু রাঙা হলো। "পাল্টে ফেলছি তো। এদ্দিন সুজাতা চৌধুরী ছিলাম। এবার থেকে সুজাতা মজুমদার লিখতে হবে। সেজন্যেই তো বিয়ে করছি।"

কী দুষ্টু সুজাতাদি! দু-জনেই হাসলাম খুব। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি অতনুদার যমুনা বৌদিকে দেখেছো?"

"হ্যাঁ—। দেখেওছি, বুঝেও নিয়েছি।"

"কি বললে তাকে?"

"কি বলবো আবার। রান্না চমৎকার, কিন্তু এমন নিন্দে করলাম, সে বোধ হয় সারাজীবন আমার মুণ্ডুপাত করবে," বলতে বলতে সুজাতাদি হেসে উঠলো।

আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। বললাম, "কে জানে, ওরা হয়তো ভালোই ছিলো সবাই, কেন তুমি মিছিমিছি ওদের মধ্যে পড়তে গেলে?"

"মিছিমিছি!" সুজাতাদি হঠাৎ উথলে উঠলো গরম দুধের মতো। "আমি অতনুকে ভালোবাসি এমনি এমনি? ও আর্টিস্ট, ওর সমস্ত সম্ভাবনা এসব ছেলেমানুষি করে নষ্ট হয়ে যাবে, আর আমি চুপ করে বসে বসে দেখবো?"

"কিন্তু অতনু কি সত্যি সত্যি ভালোবাসে তোমায়?" আমি বলে দেখলাম সোজাসুজি, "যদি ভালোবাসতো, কলকাতা ছেড়ে সে চলেও যেতো না, অন্নপূর্ণার জন্যে এত সহানুভূতিও তার মনে আসতো না।"

সুজাতাদির সঙ্গে আমার যে সহজ বন্ধুত্ব ছিলো তাতে সে খুব

খোলাখুলি কথা বলতে পারতো আমার সঙ্গে। নির্বিকার ভাবে বললে, "ও আমায় ভালোবাসে কি বাসে না, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি ওকে ভালোবাসি, ওকে আমার চাই, এই হোলো সোজা কথা। ওকে বাঁধতে না পারলে ও জীবনে বড়ো হতে পারবে না। এবং আমি ছাড়া আর কেউ ওকে বাঁধতে পারবে না।"

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সুজাতার কথা শুনে।

বিয়ের প্রায় ঠিকঠাক। নেমন্তন্নের চিঠি ছাপাতে দেওয়া হয়ে গেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুজাতার বিয়ে হোলো না অতনুর সঙ্গে।

হঠাৎ শুনলাম অতনু পালিয়ে গেছে। সে চলে গেছে বম্বে।

কেতকীর মুখে দেখলাম একটা আশ্চর্য চাপা আনন্দ। আমায় বললো, "পরিমলদা, অতনুদা একদিন সত্যিই খুই ভালো ছবি আঁকবে।"

অতনুর পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার ভালো ছবি আঁকতে পারার কি সম্পর্ক সেটা জানতে চাইলাম।

কেতকী চুপ করে রইলো, কিছু বললো না।

কিন্তু চলে গেল কেন?—জানতে চাইলো সুজাতার চেনাশোনারা, —ওদের মধ্যে কি ঝগড়া হয়েছে?

নানাজনের মুখে নানারকম কথা শোনা গেল। সুজাতাদি নাকি জানতোই না, আঁচই করতে পারেনি যে অতনু চলে যাবে। আগের দিন সকাল বেলা তুজনের দেখা হয়েছে। অনেকক্ষণ গল্প করেছে তুজনে বসে। পরিকল্পনা করেছে বিয়ের পর তুজনে বেড়াতে যাবে কুলু-ভ্যালি। সেখানে গিয়ে একটি কটেজ ভাড়া করবে। অতনু আঁকবে ছবি, সুজাতা বসে বসে তার ছবি আঁকা দেখবে।

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে, চিঠি ছাপতে দেওয়া হয়েছে, দুদিন পরে আশীর্বাদ।

সন্ধ্যেবেলা অতনুর আসবার কথা ছিলো।

আসবার সময় পেরিয়ে গেল।

ছটফট করতে লাগলো সুজাতা। বার বার বারান্দায় এসে এসে দেখলো। তারপর ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে রইলো বারান্দায়।

অতনুর দেখা নেই।

সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। গভীর হয়ে এলো রাত্রি।

অতনু সেদিন আর এলো না।

পরদিন সকালে এক ছোকরা চাকর একটি চিঠি নিয়ে এলো সুজাতার কাছে।

দু লাইন চিঠি।—সুজাতা, আমি চলে যাচ্ছি। অনেক ভেবে দেখলাম। আর দশজনের মতো সংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু ছবি আঁকতে চাই।

"আগেই জানতাম,"—বললো সুজাতার চেনাশোনারা। "শুধু ছবি আঁকতে চায়, তাই বিয়ে করবে না? এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি। আসল কথা, অতনু লোক ভালো নয়। বিয়ে করবে বলে দুদিন ওর সঙ্গে একটু খেলা করে চলে গেল। এমন না হলে আর্টিস্ট? তার উপর প্যারিস-ফেরত। ওরা ওরকমই হয়।"

সুজাতাদি মাসখানেকের মধ্যে বেশ রোগা হয়ে গেল।

তারপর কেটে গেল প্রায় বছরখানেক।

ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে এম-এ পাশ করলো সুজাতাদি।

॥ সাত ॥

যদ্দূর জানা যায়, অতনু মজুমদার বম্বে গিয়ে বেশী ছবি আঁকেনি। যারা আজকাল ওর ছবি নিয়ে আলোচনা করে, ওরা অতনুর এসময়ের আঁকা কোনো ছবির সন্ধান পায়নি। অল্প যা কিছু এঁকেছিলো, সে সব কি করে নিখোঁজ হয়ে গেল সেটা ওদের কাছে একটা মস্ত রহস্য যা নিয়ে ওদের তর্কের শেষ নেই।

এ সময় সে বম্বেতে কি ভাবে কাটিয়েছে সে কথাও বাইরের লোকে বেশী কিছু জানেনা। নানা কাগজে মাঝে মাঝে তার যা জীবন-বৃত্তান্ত আজকাল বেরোয় তাতে শুধু একটু বলা হয় যে, সে এ সময় একটি সামান্য আর্টিস্টের কাজ নিয়েছিলো এক মাঝারী পাবলিসিটি ফার্মে। কফি-হাউসের টেবিলে মাঝে মাঝে শোনা যায় কিছু টুকরো টুকরো গুজব যা সত্যি কিনা জানবার আগেই সবাই সত্যি বলে মেনে নিতে চায়।

প্রথম দিকে অতনুর অন্তরঙ্গ ও অনুরাগী মহলও যে বেশী কিছু জানতো তা নয়। অতনু কাউকে চিঠিপত্র লিখতো না। অনেকে ওর উপর বিরূপ হওয়ায় ওর কোনো খোঁজ খবর নেওয়ারও চেষ্টা করেনি। সুজাতাদিও ওর নাম মুখে আনতো না। কেতকী আর সুরজিতও কিছু জানতো না।

অতনু চলে যাওয়ার প্রায় মাস ছয়েক পরের কথা। হঠাৎ সুজাতাদির কাছে কল্যাণীদির একটি চিঠি এলো বম্বে থেকে।

কল্যাণীদির স্বামী সেই ডাক্তার ভদ্রলোক চাকরি করতো বম্বেতে। যদ্দূর মনে পড়ে তাঁর নাম অমরেশ। অতনুর সঙ্গে তার যে বেশ একটা সখ্যতা ছিলো সেটা কল্যাণীদির বিয়ের সময়েই দেখেছিলাম।

অতনুর সঙ্গে যে কল্যাণীদির বিয়ের কথা হয়েছিলো এক সময়, সে খবর সে হয়তো জানতো না, কিংবা জানলেও সেটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। বিয়ের পর কল্যাণীদিকে নিয়ে চলে গিয়েছিলো বম্বে। তারপর কল্যাণীদি আর অনেকদিন কলকাতায় আসেনি।

সুজাতাদির সঙ্গে কল্যাণীদির বাক্যালাপ ছিলো না। বিয়ের সময় নেমন্তন্নও করেনি। এদ্দিন পর সে হঠাৎ সুজাতাদির কাছে চিঠি লিখেছে শুনে অবাক হলাম।

সুজাতাদি খুব গম্ভীর মুখ করে চিঠিখানি বার করে আমায় পড়তে দিলো। আজ এতবছর পরেও আমার পরিস্কার মনে আছে চিঠির কথাগুলো। ঘৃণায় ঈর্ষায় আর ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়েরা যে একজন আরেকজনের সঙ্গে কতো নিষ্করুণ আর নির্মম হতে পারে সেটা সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করলাম।

"ভাই সুজাতা!"—খুব মিষ্টি করে চিঠি শুরু করেছিলো কল্যাণীদি —"কতোদিন তোর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। তোকে কতোবার চিঠি লিখবো লিখবো ভেবেছি, কিন্তু সংসারের এটা ওটা সেটা নানা কাজের ঝামেলায় কিছুতেই সময় হয়ে ওঠে নি। তোর কথা আমার সব সময় মনে পড়ে। বিয়ে থা না করে তুই খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিস। তুই পড়াশুনো করছিস, নিজের একটা 'কেরিয়ার' তৈরী করে নিবি একদিন। আমরা বিয়ে করে বোকামী করেছি। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে অতীত ব[illegible]ান ভবিষ্যত সব একাকার হয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। তোর কথা কতো যে মনে পড়ে কি বলবো। ওঁকে কতো বলি তোর কথা। আমার উপর উনি রাগ করেন মাঝে মাঝে, বিয়ের সময় ওঁর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিইনি বলে।"

সুজাতাদি আমায় চিঠিখানি ওকে পড়ে শোনাতে বলেছিলো। এটুকু পড়তেই সে বলে উঠলো,—"ন্যাকা!"

আমি মুখ তুলে সুজাতাদির দিকে তাকালাম।

"হিপক্রীট আর কাকে বলে! কি দেখছো অবাক হয়ে? পড়ে যাও পরিমল, আরো অনেক কিছু আছে তোমায় অবাক করে দেওয়ার মতো।"

"এক সময় তোর উপর খুব রাগ করেছিলাম,"—আমি পড়ে গেলাম,—"কেন রাগ করেছিলাম সেকথা আজ আর আলোচনা করে লাভ নেই। তবে সে সময় খুব কষ্ট হয়েছিলো। আজ কিন্তু আমার কোনো রাগ নেই। উনি এত ভালো যে আমার পক্ষে আর সে রাগ পুষে রাখা সম্ভব নয়। আমার সৌভাগ্য যে ওঁর মতন এরকম ভালো স্বামী পেয়েছি। অতনুদার কথা ভাবতে আজ আমার বেশ মজা লাগে। কারো সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে সেটা ভেঙ্গে যাওয়া নাকি তার জীবনে এমন কিছু নতুন নয়। বেশ কয়েকবার হয়েছে বলে শুনেছি। সেদিন কে যেন বলছিলো এই কিছুদিন আগেও কলকাতায় একটি খুব ভালো মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হয়েছিলো। আশীর্বাদের দুদিন আগে সে বম্বে পালিয়ে এসেছে। অতনুদা বেশ মজার লোক, না? ওকে কেউ ধরে রাখতে পারে না।"

পড়তে পড়তে আমার হাসি পেলো। কোনোরকমে হাসি চেপে সুজাতাদির মুখের দিকে তাকালাম। খুব গম্ভীর সেই মুখ। বললো, "কী ছোটোলোক! ও যে জানে না তা নয় একেবারেই। সবই জানে। ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজছে।"

"অতনুদাকে সেদিন জিজ্ঞেস করলাম,"—আমি পড়তে শুরু করলাম,—তারপর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মানে? কল্যাণী-দির সঙ্গে অতনুদার দেখা হয়েছে বুঝি?"

"পড়ে যাও, সবই বুঝতে পারবে।"

"অতনুদাকে সেদিন জিজ্ঞেস করলাম,—কেন মিছিমিছি একটি মেয়েকে দুঃখ দিলে? সে হেসে আমায় জিজ্ঞেস করলো,—তোমার কি আজ কোনো দুঃখ আছে কল্যাণী? আমি বললাম,—না, একটুও

না, বরং আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ তোমার কাছে, তোমার ওরকম মতি না হলে আমি অমরেশ বাবুর মতো অতো ভালো স্বামী পেতাম না। অতনু বললো,—এই মেয়েটিও একদিন তোমারই মতো একথাই ভাববে।"

"আমার সামনে এসে একবার বলুক তো," সুজাতাদি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, "ওর কতো সাহস একবার দেখে নেবো।"

"আমি অতনুদাকে পুরোনো দিনের কথা বেশী জিজ্ঞেস করি না," আমি পড়তে লাগলাম, "লক্ষ্য করেছি, ওর স্মৃতিশক্তি জোরালো নয়। তাছাড়া, ও কারো নাম করে না বটে, কিন্তু এমন ঠাট্টা করে কথা বলে না—যে, মেয়ে হয়ে ওসব আমার সহ্য হয় না। আমি জানি না কার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক, কিন্তু কেন সে অন্য মেয়েকে আমার চোখে ছোটো করবে, সে আমার যত অচেনা অজানাই হোক। ভালোবাসা অতনুর কাছে ছেলেখেলা হতে পারে, কিন্তু অন্য কারো কাছে নিশ্চয়ই তা নয়। তবে একটা কথা না বলে পারছি না, বুদ্ধিমান মেয়েদের দেখে শেখা উচিত, ঠেকে শেখায় কোনো লাভ হয় না। যাই হোক, অতনু আর্টিস্ট, আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি।"—আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না।

সুজাতাদি বললো, "হাসির কথা নয় পরিমল, কে ঠেকে শেখে আর কে দেখে শেখে দুদিন বাদেই বুঝতে পারবে।"

"অতনুদা সত্যি মজার লোক," তারপর লিখেছে কল্যাণী, "হুট করে তো বম্বে চলে এলো, কিন্তু কোথায় থাকবে, কি ভাবে চলবে, কিছুরই ঠিক নেই। একটা হোটেলে উঠেছিলো। ওর টাকা যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ঠিক সে সময় অমরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা। উনি অফিস থেকে ফিরছিলেন হঠাৎ রাস্তায় অতনুদাকে দেখতে পেয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে ওকে তুলে নিলেন। আমি তখন জলখাবার তৈরী করছি, উনি এসে বললেন, কাকে ধরে এনেছি দেখ। আমি বাইরে বেরিয়ে দেখি, ও মা, আমাদের অতনুদা।

জিজ্ঞেস করলাম,—বম্বেতে কি করছো ?

বললে,—কিছু না।

জিজ্ঞেস করলাম,—কোথায় উঠেছো ?

সে উত্তর দিলো,—হোটেলে।

আমি বললাম,—হোটেলে কেন ? আমরা কি তোমার এতই পর ?

যাই হোক, উনি তো জোর-জবরদস্তি করে অতনুদাকে বাড়ি এনে তুললেন। ওর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, আমরা না দেখলে দেখবে কে। কিছুদিনের মধ্যে অতনুদা এক পাবলিসিটি ফার্মে কাজও যোগাড় করে নিলো। এমন অকৃতজ্ঞ, তারপর বলে কিনা, এবার আমি অন্য কোথাও একটা ঘর দেখি। ওর কথা শুনে অমরেশ বাবুর এমন রাগ যে কি বলবো। আমাদের একটা বাড়তি ঘর আছে। বললাম, তুমি ওখানে থাকলে আমাদের কিছু অসুবিধে হবে না। অনেক বলা কওয়ার পর অতনুদা আমাদের সঙ্গেই থাকতে রাজী হোলো।

এখন দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটছে। অতনুদা সকালবেলা বসে ছবি আঁকে, আমরা ওর ঘরে বসেই চা খাই। দুপুরে দুজনেই অফিসে চলে যায়, আমি শুয়ে শুয়ে ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়ি। সন্ধ্যেবেলা সবাই মিলে বেড়াতে যাই। ছুটির দিন সারাদিন হৈ-হৈ করি। সেদিন জুহুতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। অতনুদা বেশ আরামে আছে। সেদিন বলছিলো, চিরকাল একা একাই কাটিয়েছি, কেউ যে আমার দেখাশোনা করবে, সে সৌভাগ্য হয় নি।

আমি একথা নিয়ে একটু ঠাট্টা করলাম, বললাম,—মুখ ফুটে বললেই হয়, দেখাশোনা করবার লোক খুঁজে দিচ্ছি।

আমার কথা শুনে অতনুদা গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, না ভাই কল্যাণী, অতো সুখ আমার কপালে সইবে না। আমি চাই, একজন দূরে দূরে থেকে আমার তদারক করবে, আমার থাকা খাওয়া শোওয়ার আরামের ব্যবস্থা করবে, আমি নিজের মনে নিরিবিলি

বসে ছবি আঁকবো। কিন্তু আজকালকার মেয়েরা তো তা চায় না, ওরা চায় আমি গলা জড়িয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবো। ও সব ভাই আমার ধাতে সয় না। ওসবই যদি করবো তো ছবি আঁকবো কখন? এই বেশ আছি।"

"এই হোলো চিঠির আসল বক্তব্য," সুজাতাদি বললো, "আর সব ফালতু কথা। কে আর অতনুর কি করতে পারলো, ওকে শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে আসতে হোলো আবার, ও আরাম যা পাচ্ছে আমারই কাছে পাচ্ছে,—এই হোলো কল্যাণীর মনের কথা। কিন্তু বোকা মেয়েটা অতনুকে চেনে না।"

"তুই একবার বম্বে আয়," আমি পড়ে গেলাম, "তোর এখানে খুব ভালো লাগবে। অতনুকে সেদিন জিজ্ঞেস করলাম তোর কথা। ও বললে,—কোন্ সুজাতা? তোমার সেই বন্ধু? হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কলকাতায় দেখা হোতো মাঝে মাঝে। খুব মেধাবী মেয়ে, পড়াশুনো করে। ওর কি খবর, ভালো আছে তো?

হ্যাঁ ভাই, সত্যি, আমারই খবর দিয়ে গেলাম, তোর খবর জিজ্ঞেস করলাম না একটি বারও। কেমন আছিস ভাই? তোর সেই বাচ্চা বয়-ফ্রেণ্ড পরিমলের কি খবর? সে কি তোকে এখনো দিদি ডাকে—"

"থাক, আর পড়তে হবে না," সুজাতাদি বললো, "এর পর যা লিখেছে সব আজে বাজে কথা। যেমনি অতনু, তেমনি কল্যাণী। দুজনেরই মানসিক স্তর অত্যন্ত নিচু।"

আমি আস্তে আস্তে চিঠি ভাঁজ করে রেখে দিলাম।

এ চিঠির উত্তর দেয়নি সুজাতাদি। ওর কাছে কল্যাণীর কোনো চিঠিও আর আসে নি।

অতনু কল্যাণীদের বাড়িতে আছে, এবং ভালোই আছে,—এর বেশী কিছু আর জানতে পারি নি। অতনু কারো কাছে কোনো চিঠিপত্র

বড় একটা লিখতো না। সুরজিত তাকে তিন চারটা চিঠি লিখবার পর একদিন সুরজিতের মুখেই শুনলাম, অতনু কল্যাণীদের ওখানে নেই।

—কোথায় আছে তাহলে ?

সে খবর সুরজিত দিতে পারলো না। সে কি একটা কাজে বম্বে গিয়েছিলো। তারপর সময় করে একদিন দেখা করতে যায় অতনুর সঙ্গে। গিয়ে শুনলো অতনু সেখানে থাকে না, চলে গেছে সেখান থেকে। কোথায় গেছে সে কথা বললো না অমরেশবাবু।

"আমি অবাক," সুরজিত বলে গেল, "আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ভদ্রলোক দড়াম করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কল্যাণীদির সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি ? কোনো উত্তরই দিলেন না অমরেশবাবু।"

আরো কিছুদিন কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একটা উড়ো খবর এলো।

বম্বেতে তখনো প্রহিবিশান চালু হয়নি। কোনো এক জনাকীর্ণ দরিদ্র পাড়ার একটি নিম্নশ্রেণীর বার্‌-এ নাকি দেখা যায় অতনু দিন রাত পড়ে আছে মদের বোতল নিয়ে। পাবলিসিটি ফার্মের চাকরি সে ছেড়ে দিয়েছে। ছবিও বোধ হয় আর আঁকে না। তার পরনে অত্যন্ত জীর্ণ বেশ, দেখে মনে হয় খুব অভাবের মধ্যে আছে।

কলকাতার এক ফিল্ম ডিরেক্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট বম্বে গিয়েছিলো ভাগ্য পরীক্ষা করতে। সেই নাকি কয়েকবার দেখেছে অতনুকে। তার কাছ থেকে একান ওকান হয়ে কলকাতায় এসেছে অতনুর খবর।

সুজাতাদির চোখ হঠাৎ ছলছল করে উঠলো। জিজ্ঞেস করলো, "কেন পরিমল, অতনু এত মদ খাচ্ছে কেন ?"

সুরজিতের কাছে একদিন শুনলাম, সুজাতাদি শিগগিরই বম্বে যাচ্ছে।

কিন্তু আরেকটি খবর কানে আসতে সুজাতাদির বম্বে যাওয়া আর হোলো না।

বম্বে বেড়াতে গিয়েছিলো সুজাতার মামাতো বোনের স্বামী অনিরুদ্ধ। সেই প্রথম খবরটা আনলো। তারপর কথাটা শোনা গেল আরো দু'চারজনের মুখে। তারপর আস্তে আস্তে কথাটা অন্তরঙ্গ মহলে ছড়িয়ে পড়লো।

অমরেশবাবুরই প্রতিবেশী ছিলো অনিরুদ্ধর এক বন্ধু। অনিরুদ্ধ সেখানেই উঠেছিলো। সেখানেই প্রথম শুনতে পায় ঘটনাটা।

কল্যাণী, অমরেশবাবু অতনু তিনজনে মিলেমিশে বেশ ছিলো। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কল্যাণীর স্বামী অতনুর উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠেছে। একদিন অতনুর সঙ্গে তার ভীষণ ঝগড়া। কি নিয়ে ঝগড়া কেউ ঠিক জানে না, তবে নানা কথা বলছে নানা লোকে। দেখা গেল, অতনুর পক্ষ নিয়ে কল্যাণী ঝগড়া করছে তার স্বামীর সঙ্গে। বলছে, ওকে আমি এনে রেখেছি আমার বাড়িতে, তুমি ওকে চলে যেতে বলার কে? একদিন ওর স্বামীকে বলতে শোনা গেল,—আজ অফিস থেকে ফিরে এসে যদি দেখি ওই লোকটা বাড়ি থেকে যায়নি, আমি ওকে পুলিসে দেব।

অফিস থেকে ফিরে এসে কল্যাণীর স্বামী দেখলো, অতনুর ঘর খালি। সে নেই। খুব খুশী হয়ে নিচের শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলো, কল্যাণীও নেই। শুধু একটা চিঠি পড়ে আছে টেবিলের উপর।

তখন পর্যন্ত শুনেছিলাম ওটুকুই। পরে নানাজনের মুখে নানারকম ভাবে শুনেছিলাম কল্যাণী ও অতনুর ইতিহাস। টুকরো টুকরো ভাবে সবটাই হয়তো সত্যি।

ঝগড়ার সূচনার কাহিনী শুনেছিলাম কল্যাণীদির ভাই অনিমেষের মুখে। অতনু যে ওদের সঙ্গে থাকতো তার জন্যে তার মাসে মাসে টাকা দেওয়ার কথা কল্যাণীদের। অমরেশবাবু প্রথমটা নিতে চায়নি। অতনু জোর করেই টাকাটা গুঁজে দিয়েছিলো কল্যাণীর

হাতে। বলেছিলো, স্থায়ীভাবে যখন থাকবো তখন টাকা না নিলে চলবে কেন? যদি টাকা না নিতে চাও তো বলে দাও, আমি অন্য কোথাও একটা ঘর দেখে চলে যাই।

এ কথা শুনে কল্যাণীকে টাকা নিতে হয়েছিলো।

আস্তে আস্তে দেখা গেল সংসারে টাকার টান পড়ছে। অমরেশবাবু ভালো চাকরি করে, ভালো মাইনে পায়, এরকম টাকার টান পড়বার কথা নয়। প্রথমটা কিছু প্রশ্ন করলো না, কিন্তু নজর রাখলো। দেখলো, কল্যাণীর মতো হিসেবী মেয়ে বড্ড বেশী টাকা খরচা করছে। আগে বাড়িতে যে চাল আসতো, এখন তার চাইতে অনেক বেশী দামী চাল আসছে, প্রত্যেকদিন রাত্তিরে মাংসের একটা না একটা নতুন ধরনের রান্না হচ্ছে। সকাল বিকেল চায়ের সঙ্গে জলখাবারের খরচাটা বেড়ে গেছে অনেক। বাড়িতে দুধ আসছে তিন গুণ পরিমাণে। সব সময় বাড়িতে এত ভালো খাওয়ার আয়োজন দেখে অমরেশ বিস্মিত হোলো। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলো যে এর উপলক্ষ অতনু। তাঁকে সকাল বিকেল শুধু দুধই খাওয়ানো হচ্ছে দিন দু-পাউণ্ড।

কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, "অতনুদা আর্টিস্ট লোক। একটু ভালো খাওয়া দাওয়া না করলে সে ভালো ছবি আঁকবে কি করে?"

অতনুর কয়েকটা নতুন সুট এলো, নতুন জুতো এলো, নতুন ফার্নিচার এলো ওর জন্যে। অমরেশ প্রথমে ভেবেছিলো এসব সে নিজের টাকায় করছে। তারপর একটু পর্যবেক্ষণ করতে বুঝতে পারলো, অতনু যে-টাকা মাইনে পায়, তাতে এসব সম্ভব নয়। মনে মনে বিরক্ত হোলো, তবু মুখে কিছু বললো না তখনো। ভাবলো, এ একটা বাড়াবাড়ি, তবে কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর একদিন জানতে পারলো, অতনু তার মাসিক খরচার বরাদ্দ টাকাটা দেয় না। খরচা যা চলছে সব অমরেশের টাকাতেই।

এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে কলহ হোলো একদিন। অমরেশ কল্যাণীকে বললো খরচা কমাতে। কল্যাণী খুব রাগারাগি করলো তাই নিয়ে। সেখান থেকেই সব গোলমালের শুরু।

এই পর্যন্ত শুনেছিলাম অনিমেষের মুখে। এর বেশী সে কিছু বলতে পারে নি, সম্ভবত বলতে চায়নি। সে বলেছিলো,—এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া। অমরেশ বললো, ও যদি খরচার টাকা দিতে না পারে, ওকে অন্য কোথাও ব্যবস্থা করতে বলো। কল্যাণী বললে, ওকে আমি বড়ো ভায়ের মতো মানি। ওকে যদি চলে যেতে হয় তো আমিও এখানে থাকবো না। অমরেশ অতনুকে একদিন সোজাসুজি বলে দিলো অন্য ব্যবস্থা করতে। তখন কল্যাণীও স্বামীর উপর রাগ করে চলে গেল অতনুর সঙ্গে। অমরেশ খুব জিদী লোক, সে কল্যাণীর অভিমান ভাঙাবার চেষ্টা করলো না। তাই কল্যাণীও ফিরে এলো না। এ আর কিছু নয়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মান-অভিমানের ব্যাপার। দুদিন পরে ঠিক হয়ে যাবে।

অনিমেষের কথা শুনে আমি মনে মনে একটু হেসেছিলাম। খরচার ব্যাপার নিয়ে একটা গোলমাল হয়ে থাকতে পারে, তবে শুধু তাই নিয়ে এতটা হবার কথা। নিশ্চয় এর মধ্যে আরো কিছু আছে। কিছুদিন পরেই জানতে পারলাম যে আমার অনুমান ভুল নয়।

কল্যাণীর এক বন্ধু ছিলো, দেবযানী। এক সময় কলকাতায় কল্যাণীর সঙ্গে পড়তো। সেও তার স্বামীর সঙ্গে বম্বেতে থাকতো বলে মাঝে মাঝে যেতো কল্যাণীদের বাড়ি। তার মুখে শোনা গেল অন্য কথা।

একদিন দুপুরবেলা শরীর খারাপ হওয়াতে অমরেশ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখে, সেদিন অতনুও অফিসে যায় নি। সে তার ঘরে খাটে শুয়ে আছে। পাশে বসে কল্যাণী গল্প করছে তার সঙ্গে।

অমরেশকে দেখে কল্যাণীর মুখের উপর যেই এক পলকের ছায়া পড়লো সেটা অমরেশের চোখ এড়ালো না। সে জিজ্ঞেস করতে কল্যাণী উত্তর দিলো অতনুর শরীর খারাপ হওয়াতে সেদিন সে অফিসে যায় নি। সে একা একা কি করবে, তাই কল্যাণী বসে বসে গল্প করছিলো তার সঙ্গে।

"খুব ভালো কথা," বললো অমরেশ, "কিন্তু শরীর ভালো নেই বলে আমি যে ফিরে এলাম, কই, তুমি তো একবারও আমায় জিজ্ঞেস করলে না আমার কি হয়েছে।"

"ছিঃ, তুমি কি মনে করো আমায়," বলে কল্যাণী বিরক্তি প্রকাশ করে অমরেশের জন্যে কফি তৈরী করতে গেল।

এরকম ব্যাপার আরো একদিন ঘটতে অমরেশের টনক নড়লো। অতনু যেখানে চাকরি করতো সেখানে খবর নিয়ে জানতে পেলো, অনিয়মিত হাজিরার জন্যে ওর চাকরি খতম হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে। এ কথা শুনে অমরেশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। বুঝলো সবই, কিন্তু কি করবে ভেবে পেলো না। প্রথমে ভাবলো, কল্যাণীকে কিছুই বলবে না, চুপচাপ অতনুকে বলবে সরে যেতে। কিন্তু একদিন রাত্তিরে কলহের ঝোঁকে রাগের মাথায় বলে ফেললো কল্যাণীকে।

কল্যাণী কেঁদে ভাসিয়ে দিলো। কেঁদে কেঁদে বললো, "তুমি শেষ পর্যন্ত আমাকে সন্দেহ করলে? তোমার মন এত নোংরা?" অনেকক্ষণ পরে বললো, "বেশ, তোমায় কিছু বলতে হবে না অতনুদাকে। ওকে চলে যেতে আমিই বলবো।"

হয়তো ওখানেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হোতো, কারণ অতনু দু-একদিনের মধ্যেই অন্যত্র উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা করলো।

এমন সময় কল্যাণী অসুখে পড়লো। ওর ব্লাড-প্রেশার ছিলো অনেকদিন থেকে। হঠাৎ সেটা খুব বেড়ে গিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। আর সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে, অমরেশের হাত

ধরে কেঁদে বললো,—যদ্দিন আমি সেরে না উঠি তদ্দিন ও যেন চলে না যায়।

অমরেশ নিজে ডাক্তার, এ অবস্থায় কল্যাণীর অনুরোধ না রেখে পারলো না। ওকে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে চাইলো, কিন্তু সে গেল না। সুতরাং নার্স রাখা হোলো বাড়িতেই। অতনুও ওর খুব সেবা-যত্ন করলো এ সময়। অমরেশের অসহ্য মনে হলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না।

কল্যাণী বেশ কিছুদিন ভুগলো। ও যেন সেরে উঠতে চাইছিলো না কিছুতেই। কিন্তু অমরেশ চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখলো না। কল্যাণী আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠলো।

তবু সে মানতো না সে সেরে উঠেছে। কোনো কথা বললেই সে কান্নাকাটি করতো বাচ্চা মেয়ের মতো।

আরো কিছুদিন কেটে গেল। সেরে না ওঠার অজুহাত আর চলে না। অতনু নিজের থেকেই বললো যে, সে পরদিন চলে যাচ্ছে। একথা শুনে কল্যাণী জলভরা চোখ নিয়ে চুপ করে রইলো, কোনো উত্তর দিলো না।

পরদিন সকালবেলা অফিসে যাওয়ার আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে কল্যাণীর ঘরে ঢুকে অমরেশ দেখে অতনু দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে, আর তার হাত জোরে চেপে ধরে আছে কল্যাণী। অমরেশকে দেখেও সে হাত ছাড়লো না। তাকালোও না তার দিকে। অতনুকে বললো, "আজই যাবে কেন অতনুদা, আরও এক হপ্তা থাকো। আমি একেবারে সেরে উঠি, তারপর যেও।"

অমরেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো, তবু অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে গম্ভীর ভাবে অতনুকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি আজ যাচ্ছো?"

অতনু বললো, "যেতে তো চাই, কিন্তু—।"

"না, না, তুমি আজ যাবে না," বাধা দিয়ে বলে উঠলো কল্যাণী "তুমি আরো কিছুদিন থাকো।"

এবার অমরেশের ধৈর্যচ্যুতি হোলো। কল্যাণীর দিকে ফিরে সে বললো, "ও যদি আজ না যায়, আমি যদি অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি ও বাড়ি থেকে যায় নি, আমি পুলিসে খবর দেবো।"

কল্যাণী আর অতনু কোনো উত্তর দিল না। গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল কল্যাণীর স্বামী অমরেশ,—তারপর বিকেলবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে, অতনু নেই, কল্যাণীও নেই। শুধু কল্যাণীর একটি দু-লাইন চিঠি পড়ে আছে।

অমরেশ ওদের খোঁজ করবার চেষ্টা করলো না একটুও।

কিন্তু ওরাও আত্মগোপন করেনি। সবাই জানতো বম্বের উপকণ্ঠে একটি ঘর নিয়ে অতনু আর কল্যাণী আছে একসঙ্গে।

কিছুদিন পরে সবাই আরো জানলো যে, ওরা খুব সুখে নেই। অতনু খুব মদ খায় দিন রাত, আর কল্যাণী বসে চোখের জল ফেলে।

এখানে কলকাতায় চেনাজানারা সবাই জেনে গেল অতনুর ইতিহাস। ওকে যারা পছন্দ করতো না, ওর সম্বন্ধে আরো বেশী করে আলোচনা করতে শুরু করলো। ওকে যারা ভালোবাসতো, কেউ ওর নাম মুখেও আনলো না।

সুজাতাদিও নয়।—শুধু আমায় একদিন বলেছিলো খুব বিষণ্ন হয়ে, "অতনু আর যাই করুক, ছবি আঁকা ছেড়ে দিলো কেন?"

অতনুর সম্বন্ধে কোনো আলোচনায় যোগ দিতো না কেতকী।

সে নিজের মনে নানা ছাঁদে নতুন নতুন ভাবে ফুল সাজাতো। মাঝে মাঝে মনে হোতো তার চোখ দুটো যেন সজল হয়ে আসছে।

তিনটে চন্দ্রমল্লিকা সে একটি পাথরের বাটিতে সাজিয়েছিলো

কয়েকটি সবুজ পাতার পটভূমিকায়। এত সুন্দর!—ওদিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরানো যায় না।

সে বললো, "কি দেখছো পরিমলদা?"

আমি উত্তর দিলাম, "খুব সুন্দর হয়েছে।"

কেতকী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "জানো পরিমলদা, উনি যা খুঁজে মরছেন, আমি তা পেয়ে গেছি আমার এই ফুল সাজানোর মধ্যে।"

উনি!—প্রথমটা বুঝতে পারি নি,—ও, হ্যাঁ, অতনুদা,—মনে মনে ভাবলাম,—কোনো কোনো মেয়ে কী ভীষণ চাপা, গোপনে ব্যথা পায়, চুপচাপ সহ্য করে, কিন্তু কাউকে কিছু বলে না।

বোধ হয় কেটে গেল আরো একটি বছর। কেউ আর অতনু মজুমদারের কোনো খোঁজ খবর করে না।

একদিন হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শ্যামবাজারের চৌমাথার কাছে। দেখলাম, ওর মাথার চুলগুলো আর ছোটো নেই, বেশ লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়েছে। মুখে একগাল দাড়ি। প্রথমটা চিনতেই পারিনি।

সে বললো, "চলে এলাম। ওখানে ছবি আঁকা হচ্ছিলো না। আঁকছিলাম, কিন্তু ভালো হচ্ছিলো না কিছুতেই। সব ফেলে এসেছি, কিছু বেচে দিয়েছি, যা বেচতে পারিনি বিলিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন কিন্তু প্রচুর আঁকছি, পাগলের মতো প্রাণ ভরে আঁকছি।"

আমি বোধ হয় অনিরুদ্ধ না সুবিনয়, কাকে যেন বলেছিলাম যে, অতনুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। খবরটা কি করে যেন সুজাতার কানে গেল। সে ছুটে এলো আমার কাছে। বললো, "পরিমল, যেমন করেই হোক সে কোথায় আছে ঠিকানা খুঁজে বার করো। আমায় নিয়ে চলো তার কাছে।"

আমি ওর ঠিকানা জানতাম না। যেদিন দেখা হয়েছিলো,

সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলেছিলো, তার ঠিকানার কোনো স্থিরতা নেই, শিগগিরই বাড়ি বদল করবে, তারপর আমায় জানাবে। খোঁজ করে দেখলাম, কেউই জানেনা অতনুদা কোথায় থাকে। কল্যাণীদির ভাই অমিতাভ তো আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। সুরজিতও বললো অতনুর ঠিকানা সে জানেনা। অতনু তাদের বাড়ি যায় মাঝে মাঝে, তবে সেটা পছন্দ করে না সুরজিত। শুধু কেতকী তাকে শ্রদ্ধা করে বলেই সে কিছু বলে না। অতনু বসে বসে কেতকীর ফুল সাজানো দেখে। অতনু যতক্ষণ থাকে, সামনে উপস্থিত থাকে সুরজিতও। সে অতনুর ঠিকানা জানবার চেষ্টা করেনি। আর অতনুও কাউকে দেয়না তার ঠিকানা।

অতনু কারো সঙ্গে দেখা করতো না। কিন্তু সে যে কলকাতায় আছে একথা ছড়িয়ে পড়লো। তখন সবাই ভাবলো,—কল্যাণী কোথায়? সেও কি অতনুর সঙ্গে আছে? অনিরুদ্ধ চিঠি লিখলো বম্বেতে তার বন্ধুর কাছে। সে তার আরেকজন পরিচিতকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো। কিছুদিন পর অনিরুদ্ধ তার চিঠির উত্তর পেলো। সে গিয়ে বললো সুবিনয়কে। সুবিনয় গিয়ে বললো তার বন্ধুদের, অনেক কান ঘুরে কথাটা সুজাতাদি আর আমার কানেও এলো।

—অতনু কল্যাণীকে বম্বেতে ফেলে চলে এসেছে। এক রকম পালিয়েই এসেছে কিছু না বলে। আর আশ্চর্য মহানুভবতা দেখিয়েছে কল্যাণীর স্বামী। সে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে কল্যাণীকে।

আস্তে আস্তে অতনুর কলকাতার জীবনযাত্রার খবরও জানতে পারলো সবাই। সারা বিকেল পড়ে থাকে এক দিশী মদের দোকানে। নিজের ডেরায় ফিরে যায় সন্ধ্যের পর। একখানা ঘর নিয়েছে উত্তর কলকাতার এক বারাঙ্গনা পাড়ায়। সেখানেই সারাদিন বসে ছবি আঁকে।

অনিরুদ্ধর কাছে শুনেছিলাম সুজাতাদি যোগাড় করেছিলো সেই ঠিকানা। কিন্তু সে পাড়ার নামটা শুনে আর গিয়ে উঠতে পারেনি।

"তোমরা যে যাই বলো," কেতকী বলেছিলো একদিন, "অতনুদা ছবি ঠিকই আঁকছে। নিজের সৃষ্টির কাজে যদি কোনো শিল্পীর একনিষ্ঠতা থাকে, তাহলে সে আর যাই করুক না কেন, কিছুই আসে যায় না।"

একটা কথা আমি সুজাতাদিকে কোনোদিন বলি নি, কাউকেই বলি নি, এমন কি অতনুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দু-চার কথা জানবার জন্যে আমার কাছে যারা এসেছে, তাদেরও কোনোদিন বলি নি,—অতনুর এই অজ্ঞাতবাসের সময় আমি ওর সঙ্গে বেশ খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। মাঝে মাঝে আমি যেতাম ওর কাছে। আর কারো সঙ্গে ওর বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিলো না বলে আমি গেলে ও খুব খুশীই হোতো।

ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগও হয়েছিল খুব আকস্মিক ভাবে।

বিবেকানন্দ রোড আর সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে একদিন বিকেলবেলা বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। তখন বোধ হয় বেলা চারটা। হঠাৎ কে এসে পেছন থেকে কাঁধের উপর হাত রাখলো। ফিরে তাকিয়ে দেখি অতনু মজুমদার। তার পোশাক আর চেহারা দেখে আমি অবাক হলাম। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আর গালে লম্বা দাড়ি তো আছেই, পরনে একটি সুতির চেক লুংগি আর গায়ে মিহি চিকনের পাঞ্জাবি। তার নিচে গেঞ্জি নেই কিন্তু। চোখে কালি পড়ে গেছে। মুখ ভর্তি পান।

"কোথায় যাচ্ছিস?"

"বাড়ি। তুমি এখানে?"

"এদিকেই থাকি যে।"

আমি তার আপাদ-মস্তক তাকিয়ে দেখলাম।

সে হেসে বললো, "যেখানে থাকি, সেখানে এই পোশাকেই খুব সুবিধে।"

"ছবি আঁকো আজকাল?"

অতনু খুব জোরে হেসে উঠলো। বললো, "আমার চেহারা আর পোশাক দেখে মনে হয় না, না? তা' তোর কি দোষ, পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যখন সিগারেট খাই, ট্যাক্সি কি ফিটন গাড়ি থেকে কাপ্তেন বাবুরা নেমে কাছে ফিসফিস করে মেয়েমানুষের খোঁজ করে আমার কাছে।" এ যেন এক মস্তো রসিকতা, টেনে টেনে খুব হাসতে লাগলো সে।

আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারলাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কি সেই অতনু যে বড়ো হয়েছে লণ্ডনে, প্যারিসে, যে এত বড় ঘরের ছেলে, যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো সুজাতাদি, যার কথা মনে পড়লে আজো সুজাতাদির চোখে গোপনে জল আসে, যার উপরে ভরসা করে গৃহত্যাগ করতে চেয়েছিলো অন্নপূর্ণা নামে সেই গেরস্তঘরের বিধবা মেয়ে, যার জন্যে স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছিলো কল্যাণীদি, যার ছবির প্রদর্শনী হয়েছিলো পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রী হাউসে, যার ছবি দেখতে ভিড় করে আসে অভিজাত পরিবারের চিত্ররসিকেরা,—সে আজ সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে লাল লুংগি আর চিকনের পাঞ্জাবি পরে, খুব গর্বের সঙ্গে বলছে পানের দোকানের সামনে তাকে দেখলে কাপ্তেন বাবুরা এসে ফিসফিস করে মেয়েমানুষের সন্ধান করে।

"কি দেখছিস?"

"তোমায় দেখছি।"

"কি ভাবছিস?"

"ভাবছি, তুমি ছবি সত্যি সত্যি আঁকো কি না।"

অতনু হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললো, "ছাখ, বেঁচে আছি, নিশ্বাস নিচ্ছি, চোখ ভরে এই শহরের আলো দেখছি,

অন্ধকার দেখছি, মানুষ দেখছি, তাদের সুখ দেখছি, দুঃখ দেখছি,—সুতরাং ছবিও আঁকছি। যা দেখছি, যা অনুভব করছি, মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে, সবই রং দিয়ে ক্যানভাসের উপর ধরে রাখবার চেষ্টা করছি। জানিস, সব কিছুর মধ্যে রং আছে। ওই ছাখ, ওই যে কেরানীবাবু ছাতা হাতে গুটগুট করে বাড়িমুখো চলেছে, তার ওই চলার মধ্যে একটা রং আছে, সেটা আমার চোখ দিয়ে দেখতে হয়। ওই যে লোম-ওঠা কুকুরটাকে তাড়িয়ে ওই পাগলা ভিখিরী ডাস্টবিনে এঁটোকাঁটা কুড়োচ্ছে, তার মধ্যে রং আছে, ফর্ম আছে, রূপ আছে, সৌন্দর্য আছে, তার অনশনেরও একটা রসানুভূতি আছে। ছবি কোথায় নেই বল? যেদিকে তাকিয়ে দেখি সেদিকে ছবি, যা কিছু ভাবি তার মধ্যে ছবি, যা কিছু অনুভব করি তার মধ্যে ছবি,—যেমনি বড়ো ওস্তাদ তার সমস্ত অনুভূতি, আনন্দ বেদনা, জীবনের সমস্ত রূপ, প্রকৃতির সমস্ত প্রকাশ গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, দুপুর, গভীর রাত, জয়জয়ন্তী, বেহাগ, কেদারা, মল্লার, বাহার, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, দরবারী কানাড়ার মধ্যে প্রকাশ করে, আমারও তাই। তার হোলো সুর-ব্রহ্ম, আমার রূপ-ব্রহ্ম।—কি করে ছবি না এঁকে থাকতে পারি বল?"

আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম অতনুর কথা।

"আমার ছবি দেখবি?"

খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজী হলাম।

"আমি যেখানে থাকি, সেখানে আসতে তোর ঘেন্না হবে না?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"চল তাহলে।—হ্যাঁ, একটা কথা, আমার কথা কাউকে বলতে পারবি না। কাউকে জানাতে পারবি না আমার ঠিকানা।"

"বেশ জানাবো না।"

অনেকটা পথ। সে আমায় নিয়ে একটি রিকশ'তে উঠলো। এগলি

সেগলি ঘুরে সে আমায় যেখানে নিয়ে এলো আগে আঁচ করতে পারলে আমি সত্যি সত্যি আসতে রাজী হতাম কি না সন্দেহ। এসব অসামাজিক পাড়ার পরিবেশ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিবরণ শোনা ছিলো অন্যের মুখে, কিন্তু সে রাত্রি প্রথম প্রহরের পরিবেশ। দিনের আলোয় সে যে কী বীভৎস, সে বলা যায় না। সরু গলি, এখানে সেখানে নোংরা আর আবর্জনা। মুদীর দোকান, স্যাকরার দোকান, পানের দোকান, সব জায়গায়ই প্রায় একই চেহারার লোক। তীক্ষ্ণ কোটরগত উজ্জ্বল দৃষ্টি, এক নজরেই কোনো নবাগতকে মেপে নেওয়ার চেষ্টা। পুরোনো সব জীর্ণ বিবর্ণ বাড়ি, চিকখাটানো বারান্দা, এখানে সেখানে পাণ্ডুর পাংশু মুখ,—কিন্তু চোখ সবার একই রকম, মনে হয় যেন গাঢ়তম অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে জ্বলবে। না জ্বলে উপায় নেই, এরা অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারে সব কিছু চোখে দেখে চিনে নিতে হয়।

একটি বাড়ির সামনে অতনু রিকশ থামলো। ভেজানো দরজার সামনে দু-জন লোক কথা বলছিলো, অতনুকে দেখে একটু হেসে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই সরে দাঁড়ালো। আমার দিকে তাকালো বেশ কৌতূহল ভরে।

দরজা ঠেলে সরু গলিপথ ধরে একটু এগিয়ে তারপর একটা সিঁড়ি। অতনু স্বচ্ছন্দ ভাবে উপরে উঠতে লাগলো, আমি তার পেছন পেছন।

সিঁড়ির ধাপের উপর, দোতলার বারান্দায়, এখানে সেখানে জটলা করছিলো দু-জন চারজন করে মেয়ে। অবিন্যস্ত, বেপরোয়া তাদের দিনের বেলার বসন, গায়ে জামা নেই, পাতলা আধময়লা শাড়ি গায়ে জড়িয়ে রেখেছে কোনোরকমে। প্রায় প্রত্যেকের চোখেই কাঁচাঘুম, সারা দুপুর ঘুমিয়েছে একটানা, মুখ ধোয় নি তখনো, মুখ ঘামে তেল চিটচিটে। কারো মুখে একটুও সহজ খুশির স্নিগ্ধতা নেই। নিস্করুণ জীবন সংগ্রামে লালসাজীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতায় কঠিন তাদের অধরের ঈষৎস্ফূরিত হাসি।

অতনুকে দেখে সিঁড়ির ধাপের উপর যারা বসেছিলো, তারা পথ ছেড়ে দিলো, অন্যরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো আমাকে।

অতনু আমায় নিয়ে উঠে এলো চারতলার একটি ঘরে। দরজায় তালা দেওয়া ছিলো না। ঘরের ভিতর ঢুকলাম দুজনে। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, আসবাবপত্তর কিছু নেই, শুধু একটি তক্তপোশ। দেওয়ালে কয়েকটি পেরেক থেকে আধময়লা গেঞ্জি, পাঞ্জাবী আর তোয়ালে ঝুলছে। চারদিকে শুধু ছবি, রং আর ক্যানভাস। একটি ইজেল এক কোণে দাঁড় করানো।

সামনে ছাদ। অতনু বললো, এখানে এই একটাই ঘর। নিরিবিলি বসে ছবি আঁকি। কেউ বিরক্ত করে না, কোনো গোলমাল, ঝামেলা কিচ্ছু নেই।

আমি চারদিক তাকিয়ে দেখলাম।

"এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?"—আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

"মধ্যবিত্ত জীবনের উপর সভ্য-পরিবেশ আর সহ্য হয় না আজকাল। ওসব আড়ষ্টতা থেকে পালাতে চাই। হঠাৎ এ জায়গার সন্ধান পেয়ে গেলাম। তাই এখানেই এসে উঠলাম।"

মনে মনে খুব অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম। যদিও মনকে একথা বুঝিয়েই এখানে এসেছিলাম যে, অতনু যে পাড়াতেই থাকুকনা কেন, আমি এসেছি শিল্পীর কাছে তার ছবি দেখতে, সে কোথায় কাদের মধ্যে থাকে তাতে আমার কিছু আসে যায় না,—তবু এখানে এসে অনুভব করতে পারলাম যে অতোখানি উদারপন্থী মন আমার নয়। ওকথা শুধু মুখেই বলেছি, সে সময়কার অল্পবয়েসের কৌতূহল নিয়েই তার সঙ্গে এসেছি, তার এই বোহেমিয় বৃত্তি সহজভাবে নিতে পারি নি। বার বার শুধু একথাই ভাবছিলাম যে, অতনুর এই রুচির পরিবর্তন কেন। আরেকটু ভদ্র পরিবেশে থাকতে ওর বাধা

কি ছিলো ? এ জায়গায় ও ঘর ভাড়া পেলোই বা কি করে ? যদ্দূর শুনেছি এক বিশেষ শ্রেণীর মেয়েদের ছাড়া আর কেউ এখানে ঘর ভাড়া পায়ও না। অতনু কি করে এসে জুটলো এখানে ?

সে আমায় ওর কয়েকটি ছবি দেখালো, কিন্তু আমার ছবি দেখায় মন ছিলো না। শেষ পর্যন্ত ওকে আর জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

আমার প্রশ্ন শুনে অতনু হাসলো। বিশেষ কিছু বললো না, শুধু অল্প কয়েকটা কথায় জানালো যে কিছুদিন এ পাড়ায় ঘোরা-ফেরা সে করেছে, এর ঘরে তার ঘরে স্কেচবুক নিয়ে বসে স্কেচ করেছে, কোনো এক অবসরে বাড়িউলীর স্কেচ করে তাকে প্রসন্ন করেছে। তাকে মাসী বলে সম্বোধন করে, নিজের বাসস্থানের অসুবিধের কথা জানিয়েছে। ওর একটি বাড়তি ঘর পড়েছিলো ছাতের এককোণে, সেটি কোনোরকমে ভাড়া নিয়ে নিয়েছে।

"আসল কথাটা হোলো এই যে, এরকম পাড়ায় কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে আছে। তাই অনেক খোঁজ খবর নিয়ে, চেষ্টা চরিত্র করে ঘরটা যোগাড় করেছি। এ এক অন্য রকম লাইফ্ পরিমল, এরও একটা 'চার্ম' আছে।"

আমি বললাম, "তুমি চাইলেই ভদ্র পাড়ায় ভালো ঘর পেতে।"

"আমি তো চাইনি," অতনু উত্তর দিলো।

"অন্য কোথাও থেকে ছবি আঁকা চলতো না ?"

অতনু আমার দিকে একটু তাকিয়ে দেখলো। তারপর বললো, "ছাখ পরিমল, সার্থক শিল্পী হতে চাইলে জীবনটাকে কাঁচা দেখতে হয়, প্যারিসের শিল্পীরা লেখকেরা কতোরকম বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে থেকে তাদের ছবির বা লেখার উপকরণ সংগ্রহ করে ভাবতে পারবি না। তুই তো লিখিস, কিছুদিন এখানে আমার কাছে এসে থেকে যা তো, দেখবি লেখার কতো রসদ এখানে। জীবনের রূপ এখানে কী কঠোর, কী কঠিন, কী রকম নগ্ন, সে বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। তোদের তো বুকের পাটা নেই, তোরা নিরাপদ

পরিবেশে থেকে মধ্যবিত্ত জীবনের ফ্যাকাসে প্রেমের নরম নরম গল্প লিখবি আর মনে করবি খুব সাহিত্যিক হয়েছিস।"

মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম কি কঠোর নয়, না কঠিন নয়,—সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলাম অতনুকে।

অতনু এর উত্তর না দিয়ে শুধু বলেছিলো, "ওসব ছাড়। মধ্যবিত্তই সমাজের একমাত্র মানুষ নয়। একবার সমাজের নিচের তলার মানুষগুলোর দিকেও তাকিয়ে ত্যাখ।"

আমার তর্ক করবার ইচ্ছে ছিলো না, তাই এ প্রসঙ্গ ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে তো খুব আঁকছো, বম্বে যখন ছিলে, ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিলে কেন?"

অতনু স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কে বললে সেখানে ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিলাম?"

"অনেক দিন আগে কে যেন একবার বলেছিলো।"

অতনু অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "বম্বেতে যে সব ছবি আঁকতাম, প্রায় সবই বেচে দিতাম।"

"বেচে দিতে? কই কারো কাছে তোমার ছবি দেখিনি তো?"

অতনু হাসলো। বললো, "বেচে দিতাম সেইলারদের কাছে, শুঁড়িখানার খদ্দেরদের কাছে, চার আনা, আট আনা, দশ আনা, যা পেতাম, তাইতেই বেচে দিতাম।" আমার বিস্ফারিত চক্ষু দেখে তাড়াতাড়ি বললো, "সে সব এমন কিছু ভালো ছবি নয়, সব ছোটো বড়ো মাঝারী স্কেচ। না বেচলে আমার চলতো না। সে সব ছবি না আঁকলেও আমার চলতো না।"

আমি কি বলবো ভেবে পেলাম না। একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু ছবি রেখে দাও নি কেন? পরে যখন একজিবিশান করবে, সেখানে কাজে লাগতো। তোমার ছবির ক্রমিক পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা করবার জন্যেও তো সে সব ছবি দরকার। যাদের কাছে ছবি বেচেছো, ওরা কি আর সেগুলো যত্ন করে রেখে দেবে?"

অতনু খুব ধীর নিচু গলায় আস্তে আস্তে বললো, "ওসব ছবি কাউকে দেখানো যায় না।"

আমি অবাক হয়ে অতনুর দিকে তাকালাম।

অতনু কি যেন ভাবছিলো, হঠাৎ বললো, "সে সময়কার ছবি দু-চারটা বোধ হয় আছে। দেখবি ?"

আর কোনো কথা না বলে সে একটি সুটকেস খুলে তার ভেতর থেকে চার পাঁচটা স্কেচ বার করে আমায় দেখালো। দুটো কি তিনটে ছবি দেখে আর দেখতে পারলামনা, নামিয়ে রাখলাম ছবিগুলো। নোংরা, অশ্লীল ফটোগ্রাফ, যা চুরি করে বেচাকেনা হয়, সেসব যে আগে দেখিনি তা নয়, কিন্তু অতনুর এই ছবিগুলোর রুচির বিকৃতির কাছে সেসব কিছু নয়। শিল্পী হাজার হোক শিল্পী, তার হাতে এই বিষয়বস্তুও প্রাণময় হয়ে উঠেছে, কিন্তু যে-রসের আবেদন সঞ্চার করতে চেয়েছে এসব ছবিতে, তার পরিপূর্ণতা এতখানি যে তাকিয়ে দেখা যায় না, রুচিবান কারো সামনে রাখা যায় না। এসব ছবিও অনন্য, কিন্তু অসহ্য।

আর, প্রত্যেকটি স্কেচেই একটি খুব চেনা মুখ,—সে কল্যাণীদি।

অতনুদা একটি বিড়ি ধরিয়ে নির্বিকারভাবে বললো, "সেইলারদের মধ্যে এসব ছবি খুব বিক্রি হোতো। চার আনা, ছ আনা, যা পেতাম, তাই নিতাম। এই করেই তো আমার আর কল্যাণীর সংসার চলতো।

কল্যাণীদির কথা আমি নিজের থেকে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারতাম না। অতনুও নিজের থেকে বলবে আশা করিনি। কিন্তু সে যখন কল্যাণীদির উল্লেখ করলো, তখন আর জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

"কল্যাণীদি তোমায় এসব ছবি আঁকতে দিতো ?"

"সে জানতো না। আমি তো ওকে আর মডেল করে আঁকতাম না। যখন তখন যেখানে সেখানে বসে মন থেকে আঁকতাম। তবে,

যাই আঁকতাম, দেখতাম কল্যাণীর মুখ হয়ে যাচ্ছে। আমি আর কি করবো বলো।"

আমার মনে একটা বিরূপ ভাব এলো। বললাম, "এ তোমার উচিত হয়নি। আমি তো কোনোদিনই পারতাম না।"

অতনু খুব জোরে হেসে উঠলো। "তোদের কথা আলাদা," বললো সে, "একটা গণ্ডিবাঁধা জীবনের মধ্যে আছিস, পয়সার টানাটানি আছে, কিন্তু খেতে না পাওয়ার ভয় নেই। কিন্তু আমার কথা ভেবে ছ্যাখ! পকেটে নেই একটা পয়সা, রোজগারের কোনো পথ নেই, এমন খারাপ 'রেফারেন্স' যে কেউ চাকরি দিতে চায় না। ঘাড়ের উপর একটা অন্যের বৌ, যে শুধু আমার ভরসা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।"

"যাই হোক, আর কিছু করতে না পারলে মুটেগিরি করতে।"

"ওরে গাধা, মুটেগিরি করা সম্বন্ধে তোর কোনো ধারণা নেই। অন্য মুটেরা আমায় মুটেগিরি করতে দিলে তো মুটেগিরি করবো। চেষ্টা সবরকম করেছি। কিছুই হোলো না।"

"কল্যাণীদিকে না তুমি ভালোবাসতে? তাকে নিয়ে এরকম সব ছবি আঁকলে কি বলে?"

"ভালোবাসতাম?" অতনু ভুরু উত্তোলন করলো, "একটুও না। ও আমায় ভালোবাসতো। আমি ভালোবাসতাম না।"

"তাহলে ওকে নিয়ে বেরিয়ে এলে কেন?"

"আমি তো ওকে আনিনি। সেই এসেছিলো। আমি অনেক মানা করেছিলাম। সে না শুনলে কি করবো?"

কল্যাণীদির গল্প সে আমায় একদিনে বলেনি। বিভিন্ন দিনে একটু একটু করে বলেছিলো।

অতনুকে বাড়িতে খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলো কল্যাণী আর ওর স্বামী। প্রথমদিকে কল্যাণীর সেবা-পরিচর্যা ছিলো খুব

স্নিগ্ধ মধুর, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অতনু লক্ষ্য করলো সুজাতার কথা নিয়ে তাকে নানারকম ভাবে খোঁটা দিচ্ছে কল্যাণী।

একি অতনুদা, তুমি এত ঝাল খাওয়া শিখলে কোথায়? সুজাতা তোমার এ অভ্যেস করিয়েছে বুঝি? সে তো ভীষণ ঝাল খায়।...এত কড়া চা খাও কেন? সুজাতার এ অভ্যেসটা খুব খারাপ। সেও বড্ড কড়া চা খায়।...ভাগ্যিস সুজাতার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি অতনুদা, নইলে তুমি এত ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে পারতে না। ও তো এসব হাল্কা বই একেবারে পছন্দ করে না।...এমনিতরো সব নানা রকম কথা। সুজাতার এ অভ্যেসটা খারাপ, ওই অভ্যেসটা খারাপ, সুজাতার পছন্দ ভালো না, সুজাতার রুচি বলে কিছু নেই,... আচ্ছা, অতনুদা, আমি এত সাধছি আর দুটো লুচি খাওয়ার জন্যে, আমার কথা শুনছো না, সুজাতা হলে তো কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে নিতে।...সুজাতা বড়লোকের মেয়ে, ওকে বিয়ে করে কলকাতায় সুখে থাকতে, কেন এখানে মরতে এলে অতনুদা!

দু-দিনেই অতনু অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একদিন চটে গিয়ে বললো, "আমার কাছে আর সুজাতার নাম করবে না।"

কল্যাণী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো অতনুর দিকে। খুশিতে যেন তার মুখ ঝলমল করে উঠলো। তারপর খুব আস্তে বললো, "আচ্ছা, ওর নাম তোমার কাছে আর কোনোদিন করবো না।"

একদিন কল্যাণী হঠাৎ অতনুকে বললো, "আজ তুমি অফিসে যেয়ো না।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো অতনু।

"আজ আমার একটা ছবি আঁকো।"

অতনু কল্যাণীর চোখে কি দেখলো কে জানে, রাজী হয়ে গেল। দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া সেরে কল্যাণী এলো অতনুর ঘরে। সে তাকে জানলার কাছে একটি মোড়ার উপর বসিয়ে দিয়ে স্কেচ করতে

সুরু করছিলো, হঠাৎ কল্যাণী একটু অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললো, "এভাবেই আঁকবে ?"

অতনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কিভাবে আঁকবো তা হলে ?"

কল্যাণী মুখ ফিরিয়ে হেসে বললো, "আমি জানতাম তুমি প্যারিস ঘুরে এসেছো। এমন দেখছি তুমি একেবারে ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট।"

অতনুর ভালো লাগলো না কল্যাণীর ধরনধারণ। সে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, কল্যাণী তার আগে বলে ফেললো, "আমি শুনেছি তুমি নাকি সুজাতার একটি ভারী সুন্দর ছবি এঁকেছো !"

অতনু কোনো কথা না বলে কল্যাণীকে ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। নিজের মনে একটা অন্য ছবি এঁকে ঘণ্টা তিনেক পরে দরজা খুলে দেখে, বাইরে মেঝের উপর বসে আছে কল্যাণী, বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

অমরেশ খুব ভালোবাসতো কল্যাণীকে,—অতনুদা একদিন বলছিলো। বৌকে খুশি করবার জন্যে ভদ্রলোকের কী আপ্রাণ চেষ্টা। কল্যাণী যা চায় তাই এনে দিচ্ছে, যেখানে যেতে চাইছে নিয়ে যাচ্ছে, যা কিনতে চায় কিনে দিচ্ছে। কিন্তু কল্যাণীর এমন কিছু নজর ছিলো না অমরেশের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে। ওকে এত অবহেলা করতো যে দেখে অতনুর রাগ হোতো।

"সে যে কী পরিস্থিতি, ভাবতে পারবি না পরিমল," অতনু বললো, "আমার জন্যে কল্যাণীর এত যত্ন, এত সেবা, অথচ অমরেশের জন্যে একটা নির্মম অবহেলা। বেশ বুঝতাম অমরেশ মনে মনে জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু পাছে কল্যাণী সেটা বুঝতে পারলে রাগ করে, তাই মনের রাগ মনে চেপে আমার সঙ্গে খুব বন্ধুর মতো তার ব্যবহার, আমার কিসে আরাম হয়, কিসে সুবিধে হয়, কিসে তৃপ্তি হয়, সব সময় সেই ভাবনা। আমার এত অস্বস্তি লাগতো যে, কি বলবো। মনে হোতো যেন পালাতে পারলে বাঁচি।"

কিন্তু চলে যাওয়া আর হোলো না। অতনু যখন প্রায় স্থির করে ফেলেছে যে সে চলে যাবে সামনের মাসে, এমন সময় কল্যাণী একটি সোয়েটার বুনে শেষ করলো অতনুর জন্যে। অমরেশের সামনেই সেটি অতনুকে দিলো পরবার জন্যে। সোয়েটার দেখে অমরেশের মুখ হোলো গম্ভীর। সে তার নিজের সোয়েটারের জন্যেই এই উল কিনে এনে দিয়েছিলো কল্যাণীকে।

সন্ধ্যের পর এক সময় অতনুকে এসে খুব আস্তে আস্তে বললো, "অতনু, তুমি আমার বন্ধু। কল্যাণী আমার স্ত্রী। আমি তোমাকেও ভালোবাসি, কল্যাণীকেও। আমি তোমাকেও হারাতে চাই না, কল্যাণীকেও না। কিন্তু তুমি যদি আরো কিছুদিন থাকো, তাহলে তোমার সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব থাকবে না, কল্যাণীর সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক থাকবে না। তাই বলছি, বেশী বাড়াবাড়ি হবার আগে তুমি এখান থেকে চলে যাও।"

অতনু নিজের থেকেই চলে যেতো, কিন্তু একজন যে তাকে চলে যেতে বলছে, এটা তার সহ্য হোলো না। সে নির্বিকারভাবে বললো, "কল্যাণীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, সে যদি চলে যেতে বলে, আমি নিশ্চয়ই চলে যাবো।"

এখানে পৌরুষ দেখাতে পারলো না অমরেশ, একথা জোর গলায় বলতে পারলো না যে, এটা আমার বাড়ি, আমি যা বলছি তাই হবে, আমি তোমায় চলে যেতে বলছি, তুমি চলে যাও।— এ কথা না বলে, সে বলতে গেল কল্যাণীকে।

"কল্যাণীদি তোমায় খুব ভালোবাসতো অতনুদা ?"

অতনু আমার প্রশ্ন শুনে আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "খুব হাল্কা ভাবে বললে সে কথা বলা যায় বটে, কিন্তু সে ভালোবাসা খুব গভীর বলে আমার মনে হয়নি কোনোদিন।"

আমি অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"দখল করবার নেশাকে ঠিক ভালোবাসা কি বলা যায়?" উত্তর দিলো অতনু, "ওর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হয়নি, সুজাতার সঙ্গে যে আমার অন্তরঙ্গতা হয়েছিলো, এটা সে সহ্য করতে পারে নি। তাই সে আমার মন জয় করতে চেয়েছিলো। সত্যিকারের ভালোবাসা একটা মনের জোর দেয়। ভালোবাসা রোমান্টিসিজ্‌ম্ নয়, আকাশের চাঁদ আর গাছের ফুল নিয়ে কল্পনা বিলাস নয়। কিন্তু এর উপরে কল্যাণী উঠতে পারলো না। খুব জিদ দেখিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলো বটে, কিন্তু তারপর একদিনও তার মুখে হাসি দেখিনি। দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে ঘরকন্না করার যে কঠোর বাস্তবতা, তার মুখোমুখি হতে পারলো না কল্যাণী। তার শরীর, মন, দুটোই ভেঙে পড়লো।"

একটু চুপ করে থেকে অতনু বললো, "এটাই আমায় সব চেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছিলো। আমি তো ওকে ভালোবাসতাম না, শুধু ওরই আত্মমর্যাদার কথা ভেবে এত বড় ঝুঁকি মাথার উপর নিয়ে ছিলাম। আমি ওর জন্যে কি ছেড়েছি, সেটা সে কোনোদিন বুঝলো না। আমার জন্যে ও কি ছেড়ে এসেছে, তারই অনুশোচনা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।"

অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে কেটেছিলো অতনু আর কল্যাণীর সেই দিনগুলো। এক দুঃস্থ অনুন্নত অঞ্চলে জীর্ণ বাড়িতে একখানি আলো-হাওয়াবিহীন ঘর, আশেপাশে শুধু দৈন্য আর বেতালা বেসুরো জীবনযাত্রার নৈতিক বিশৃঙ্খলা। কল্যাণী ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতো, তার চোখে মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠতো তার মনের একমাত্র প্রশ্ন,—এ আমি কোথায় এলাম!

"যদি আমার আর্থিক স্বাচ্ছল্য থাকতো," অতনু বলেছিলো আমায়, "তার মনের উপর এতখানি প্রতিক্রিয়া হোতো কিনা

জানি না। হয়তো ভুলে থাকতে পারতো। কিন্তু তখন আমাদের দিন যে কি ভাবে কেটেছে ভাবতে পারবি না পরিমল।”

সারাদিন অতনু বাড়ি নেই, ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজের সন্ধানে। সারাদিন কল্যাণী একা, দিনের শেষে অতনু বাড়ি ফিরলে ওকে কি খেতে দেবে, নিজে কি খাবে জানে না। একদিন নয়, দুদিন নয়, এমনি করে দিনের পর দিন। রং কেনবার পয়সা নেই, মনের খুশি মতো ছবি আঁকা যাচ্ছে না, যতক্ষণ বাড়িতে থাকতো, অতনু শুধু স্কেচ করতো বসে বসে। কল্যাণীর মুখে একটু হাসি নেই, একটু মিষ্টি কথা নেই। পাড়ার দু-তিন জন গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক একদিন অতনুকে মেরে নাক মুখ ফাটিয়ে দিলো। কল্যাণী শুধু একটি গামছা ভিজিয়ে এসে দেওয়া ছাড়া অতনুর আর কোনো পরিচর্যা করলো না। কয়েকদিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী হয়েছিলো কল্যাণী। অতনু শুধু তাকে দুবেলা একটুখানি বার্লি করে খাওয়ানো ছাড়া আর কোনো রকম সেবাশুশ্রুষা করতে পারেনি, কোনো ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করতে পারেনি। শুধু কাছে বসে স্কেচের পর স্কেচ করে গেছে, আর মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে, তার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কল্যাণী।

সে একদিন জিজ্ঞেস করলো,—এমনি করে আর কদ্দিন চলবে?

অতনু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, কোনো আশার বাণী শোনাতে পারেনি, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলো,—তুমি যদি চাও তো অমরেশের কাছে ফিরে যেতে পারো।

ঘাড় নেড়েছিলো কল্যাণী, উত্তর দিয়েছিলো,—সে আর কি করে সম্ভব! যেদিন আর সহ্য করতে পারবো না, সেদিন গলায় দড়ি দেবো, এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

কেউ কাউকে বলতে পারলো না, যা হবে হোক, জীবনে যতো বিপর্যয় আসবে আসুক, তুমি আছো, আমি আছি। দুজনে দুজনার

হাত ধরে পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে পারলো না। বিষিয়ে উঠলো ঘরের আবহাওয়া।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম একথা শুনে, "কল্যাণীদি তো লেখা-পড়া শিখেছে। ও কোথাও একটা স্কুল মাস্টারি যোগাড় করে নিতে পারলো না?"

অতনু ম্লান হেসে উত্তর দিয়েছিলো, "ওকে বলেছিলাম। ও তেড়ে উঠে বলেছিলো,—তোমার জন্যে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, তাই অনেক। এর পরে কি আমায় চাকরি করে তোমায় খাওয়াতে হবে? সে আমি পারবো না।"

আসল কথা, কল্যাণীদির মনের জোর ছিলো না একটুও।

অতনু হাসতে হাসতে বললো, "একদিনকার ঘটনা শোন। কাছাকাছি এক রাস্তায় একটি গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ব্যাটারি খারাপ, স্টার্ট নিচ্ছিলো না কিছুতেই। গাড়ির মালিক আমায় আর আরেকজনকে বললো গাড়ি ঠেলে দিতে। কিছুক্ষণ গাড়ি ঠেলে দেবার পর গাড়ি স্টার্ট নিলো। গাড়ির মালিক আমায় দিলো দু-আনা আর অন্যজনকে দু-আনা। অন্য লোকটি তো তার পয়সা নিয়ে চলে গেল। কল্যাণী দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিলো। আমি খুব খুশি হয়ে তার হাতে সেই দু-আনিটা দিতে সে একটু তাকিয়ে দেখে সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আনিটা ছিলো অচল। হঠাৎ আমায় গাল দিতে শুরু করলো কল্যাণী। সে কি নোংরা গালাগাল, তুই ভাবতে পারবি না পরিমল। কল্যাণীর মুখে ওই ভাষা! আমি অবাক হলাম, কিন্তু দুঃখিত হলাম না, ভাবলাম, যাক, ওর মন হাল্কা হয়ে যাক। গালাগাল দিতে দিতে সে হঠাৎ থেমে গেল। বোধ হয় নিজেই অবাক হোলো নিজের ভাষায়। মুখ ফিরিয়ে চোখের জল ফেলে চলে গেল। তারপর তিন দিন গুম হয়ে ছিলো।"

অতনুদের কাছেই থাকতো ডিক্রুজ নামে এক গোয়ানীজ।

দিশী বিদেশী নাবিকদের সঙ্গে তার মেলামেশা। সবাই জানতো মেয়েমানুষের দালাল সে। মাঝে মাঝে অতনুর খোঁজ-খবর নিতে আসতো, আড় চোখে তাকিয়ে দেখতো কল্যাণীকে। তার মাথায় কি মতলব খেললো কে জানে, একদিন অতনুকে বললো—তুমি ছবি এঁকে দাও, আমি সেগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করবো। কি ধরনের ছবি, সেকথা শুনে অতনু প্রথমে রাজী হোলো না, তারপর একদিন চারটি স্কেচ এঁকে দিয়ে এলো ডিক্রুজকে। পরদিন ডিক্রুজ এসে দেড়টা টাকা দিলো অতনুকে। সে আরো কয়েকটা ছবি এঁকে দিলো। এভাবে প্রায় প্রত্যেকদিনই এক টাকা দেড় টাকা করে পেতে শুরু করলো অতনু।

সে সাবধান থাকতো যাতে কল্যাণীর হাতে সে সব ছবি না পড়ে। কল্যাণীও সাধারণত কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতো না ছবি দেখবার জন্যে। কিন্তু একদিন হঠাৎ তার হাতে পড়লো দুটো স্কেচ। অতনু ঘরে ঢুকে যখন দেখলো কল্যাণীর হাতে তার স্কেচ, তার মুখ শুকিয়ে গেল। কল্যাণীরই মুখ প্রত্যেকটা ছবিতে।

কল্যাণী চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলো অতনুকে। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললো না। মুখে শুধু একটা ম্লান হাসি। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "শেষ পর্যন্ত এই ছবি।"

আশ্চর্য ব্যাপার, অতনু বিন্দুমাত্রও লজ্জিত বোধ করলো না। নির্বিকারভাবে বললো, "পয়সা পাচ্ছি তো।"

কল্যাণী আর কোনো অনুযোগ করলো না। আরো কিছুদিন কেটে গেল।

এরপর অতনু অনেকদিন কল্যাণীর প্রসংগ আর তোলে নি আমিও জিজ্ঞেস করতাম না। মাঝে মাঝে যেতাম ওর কাছে, দেখতাম ও তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছে।

একদিন নিজেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, অতনুদা, তুমি কল্যাণীকে ফেলে পালিয়ে এলে কেন ?"

অতনু রং গুলতে গুলতে বললো, "আমি তো ইচ্ছে করে ওকে ফেলে পালাইনি।—"

সে সময় অতনু কাছাকাছি এক ফিল্ম স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করছিলো একটা কাজের জন্যে। আসল মতলব ছিলো যদি আর্ট-ডিরেক্টারের অধীনে সীন-টীন আঁকবার বা সেট তৈরী করবার কাজে যদি কিছু পায়। মাঝে মাঝে ফাঁকে তালে দু-একদিনে ক্রাউড সীনেও নেমে পড়তো। একদিন বাড়ি ফিরে দেখে কল্যাণী রান্নায় ব্যস্ত। সেদিন খুব খুশি মনে বাড়ি ফিরেছিলো অতনু। সীন আঁকবার কাজ পেয়েছে সে। ভাবছিলো কল্যাণীকে খবরটা দিয়ে খুশি করে দেবে সে। পকেটে পয়সা নিয়ে ফিরলেই তার মুখে হাসি দেখা যায়, তা নইলে বড্ড বিমর্ষ হয়ে থাকে সব সময়।

খাটিয়ার উপর বসে পা নাচাচ্ছিলো অতনু। হঠাৎ মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। পকেটে পাঁচটা টাকা ছিলো। ভাবলো এটা বিছানার তলায় রাখি। কল্যাণী যখন খুচরো পয়সা নিতে আসবে, টাকা পেয়ে খুব অবাক হয়ে যাবে। বিছানার একপাশটা তুলতেই একটা চিঠি দেখতে পেলো। খুব কৌতুহলভরে সেটি খুলে দেখে চিঠির নিচে অমরেশের নাম। চিঠির উপরের দিকে দেখতে পেলো দুদিন আগের একটা তারিখ।

অতনু আর চিঠি পড়লো না। ভাঁজ করে রেখে দিলো। দুঃখ পেলো না সে, বরং হঠাৎ খুব হাল্কা মনে হোলো নিজেকে। কল্যাণী ফিরে আসতে টাকা পাঁচটা তাকে দিলো। দেখা গেল তারও খুব খুশি-খুশি ভাব।

"সেদিন বিকেলটা বেশ ফুর্তি করে কাটিয়েছি," অতনু আমায় বললো, "আমি বাজার করে আনলাম। কল্যাণী রান্না করলো। খুব ভালো করে খাওয়া দাওয়া করলাম দুজনে। মনে হোলো কল্যাণী

কি যেন বলি বলি করেও বলতে পারছে না। আমি তো জিজ্ঞেস করলামই না, বরং ওকে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করলাম নানা কথা বলে।"

তার পরদিন সকালবেলা কল্যাণী ঘুম থেকে ওঠার আগেই বাড়ি থেকে চুপচাপ বেরিয়ে পড়লো অতনু। আর ফেরেনি সেখানে।

"আমি জানতাম অমরেশ নিতে আসবে কল্যাণীকে," অতনু বললো "কিন্তু আমি হার মানবো কেন? সে আমার সঙ্গে বেরিয়ে চলে এসেছে, আবার আমাকে ছেড়ে ওর স্বামীর কাছে ফিরে গেলে সবাই যে অপদার্থ মনে করবে আমায়। তাই ভাবলাম, তার চেয়ে লোকে জানুক, আমিই কল্যাণীকে ফেলে পালিয়ে গেছি—।"

সেদিন বেশ গুমোট সন্ধ্যে। নিচের মেয়েরা সেজেগুজে রং মেখে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, সিঁড়ির পাশে। একগাদা বেলফুলের মালা নিয়ে একটি লোক ঘরে ঘরে হেঁকে যাচ্ছে। মেয়েদের চাকরেরা জটলা করছে নিচের উঠোনে বসে। বাড়ি জুড়ে এমনি একটা থমথমে ভাব, শোরগোল নেই। শুধু একটি মেয়ের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে হারমোনিয়াম, ঘুঙুর আর চটুল গান।

অতনু সবুজ পটভূমিকার উপর লাল ছোপ লাগাচ্ছিলো এখানে সেখানে। আস্তে আস্তে বললো, "কল্যাণীকে যে খুব ভালোবাসতাম তা নয়। তবে অনেক দুঃখের দিন আমাদের একসঙ্গে কেটেছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ে ওর কথা। ওকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।"

"বা-ব্বাঃ, দুস্বপ্নের মতো, দিনগুলো গেছে"—অতনু একদিন বলছিলো, —"তবু তার একটা আমেজ রেখে গেছে। যাই হোক, এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।"

"এই আবহাওয়ার মধ্যে?" আমি হেসে ফেললাম।

"তুই জানিস না, এখানে ছবি আঁকবার একটা নতুন আঙ্গিক পেয়ে গেছি।"

এখানে অতনুর কি করে চলে, এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে মনে আসতো। কারণ, কলকাতায় ফিরে আসা অবধি অতনু কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাত বড়ো একটা করে না, পুরোনো চেনাজানাদের সঙ্গে মেলামেশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে। ছবি এঁকেই তার চলে আসছে চিরকাল, কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও ছবি বেচেছে বা কোনো কমার্শিয়্যাল কাজ করেছে বলে আমার জানা নেই।

অতনুকে জিজ্ঞেস করতে সে বললো, "বম্বেতে এক ফিল্ম কোম্পানিতে আর্ট ডিরেক্টারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কাজ করে কিছু পয়সা পেয়েছিলাম। ছয় সাত মাস চলে যাওয়ার মতো টাকা হাতে করে এখানে এসেছি। এই কদিন শুধু ছবি আঁকবো। তারপর এপাড়া থেকে সরে পড়ে পুরোনো জায়গায় ফিরে যাবো। তোরা বেশ খুশী হয়ে দেখবি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।"

"বম্বেতে থেকে গেলে না কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ফিল্‌ম্ লাইনে তো বেশ পয়সা।"

"ওধরনের কাজ আমার পোষায় না। কিছু টাকার দরকার ছিলো, তাই ওসব কাজ কিছুদিন করতে হয়েছে। পয়সা হাতে আসতে সরে পড়েছি।" একটু চুপ করে থেকে বললো, "কল্যাণী সঙ্গে থাকলে কি হোতো বলা যায় না। হয়তো থেকেই যেতাম ওই লাইনে। কিন্তু সে তো থাকলো না। ঠিক যে মুহূর্তে দুর্দিন কাটিয়ে অবস্থা পরিবর্তন হবার সম্ভাবনা দেখা দিলো, ঠিক সেই সময়েই কল্যাণী চিঠি লিখলো অমরেশের কাছে। যাক, ভালোই হয়েছে।"

"এ পাড়ায় তোমার ভালো লাগে অতনুদা?" একদিন জিজ্ঞেস করলাম, "এরকম একা একা থেকে তোমার মন হাঁফিয়ে ওঠে না?"

"একা হতে যাবো কেন রে? এখানে আমার দু'তিন জন খুব আপনজন আছে।"

"আপনজন?"

"হ্যাঁ, আপন মনে করলেই আপন। একজন তো আমার খুবই আপন। দেখবি তাকে ?"

অতনুর কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হই না। শুধু বললাম, "না, থাক, তোমার এপাড়ার আপনজনদের দেখবার ইচ্ছে আমার নেই।"

অতনু তুলি নামিয়ে রাখলো। বললো, "না, না, চল আমার সঙ্গে। তোর অতো কুণ্ঠা হবার কিছু নেই। একজনের কাছে তো আমায় যেতেই হবে আজ। মনেই ছিলো না এতক্ষণ। চল।"

গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে অতনু আমায় টেনে নিয়ে চললো। দোতলায় নেমে এলাম আমরা। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে ছিলো দু-তিনজন মেয়ে। অতনুকে দেখে একটু হেসে সরে দাঁড়ালো।

একটি বন্ধ ঘরের সামনে এসে থামলো অতনু। দরজার একপাশে বসেছিলো চোয়াড়ে দেখতে একটি লোক।

"দরজা বন্ধ দেখছি," অতনু বললো তাকে, "দেরী হবে ?"

"না বাবু, এক্ষুনি বেরোবেন।"

"তা হলে এখানেই অপেক্ষা করা যাক," অতনু বললো।

আমার খুব অসোয়াস্তি লাগছিলো। বললাম, "আমি বরং যাই।"

"কী খুঁতখুঁতে স্বভাব তোর," অতনুদা বলে উঠলো, "আমি যখন বলছি, তখন একটু দাঁড়িয়ে দেখে যা না। আমার তোর উপর ভরসা নেই না কি ?"

মিনিট পনেরো পরে দরজা খুলে গেল। ক্লান্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে এলো পাতলা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, দেখে মনে হয় পঞ্চাশের কম নয়। খুব ভদ্র, সম্ভ্রান্ত চেহারা,—অন্য কোথাও দেখলে সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করবে। কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে এক নজর তাকিয়ে উনি চলে গেলেন। ফিরে তাকিয়ে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে। পাতলা খাটো গড়ন, কোমল মুখশ্রী। দেখলে মনে হয় এপথে এসেছে খুব বেশীদিন হয়নি।

অতনুকে দেখে খুব মিষ্টি হেসে বললো, "দাদা, তোমার এতক্ষণে সময় হোলো? আমি সারাদিন তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। দুবার ওপরে গিয়েছিলাম। দেখি, তুমি ছবি আঁকছো। তাই তোমায় আর ডাকিনি। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন দাদা? এসো, ভেতরে এসো," বলে আমার দিকে তাকালো।

"এ আমার বন্ধু। আমার ছোটো ভায়ের মতো," অতনু বললো আমায় দেখিয়ে।

"আসুন," মেয়েটি বললো খুব মিষ্টি গলায়।

"আয়," অতনু বললো আমায়।

আমি একটু ইতস্তত করলাম। তারপর ভেতরে ঢুকলাম অতনুর পেছন পেছন।

বাইরে যতোটা অপরিষ্কার এবং ভ্যাপসা, ভেতরে ঢুকে দেখি একেবারে অন্য রকম। খুব পরিষ্কার চাদর পাতা, তবু আমার অসোয়াস্তি লাগছিলো সেখানে বসতে। অতনু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। বললো, "এই মেয়েটি আমার বোন হয়। আজ ভাইফোঁটা। তাই ও আমায় নেমন্তন্ন করেছে।—মিষ্টি-টিষ্টি আনিয়ে রেখেছিস তো! কি আছে বার কর।"

"আমার জন্যে কি এনেছো দাদা?" মেয়েটি হেসে জিজ্ঞেস করলো।

কাগজে মোড়া একটি ছবি ছিলো অতনুর সঙ্গে। মেয়েটি সেটি খুলে দেখলো,—ভারী সুন্দর একটি রাধাকৃষ্ণের ছবি। সে ছবিটি মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রেখে দিলো।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। মেয়েটির হাব ভাব একেবারে গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতো। গলায় আঁচল জড়িয়ে অতনুর কপালে ফোঁটা দিয়ে তার পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করলো। তারপর একপ্লেট মিষ্টি দিলো অতনুর সামনে, আরেক প্লেট আমার সামনে।

"আমি খাবো না," আমি বললাম।

"কেন রে?" অতনু জিজ্ঞেস করলো।

"আমি পেটের অসুখে ভুগছি কয়েকদিন থেকে।"

অতনু একটু মুচকি হাসলো। মেয়েটি কোনো কথা না বলে প্লেট সরিয়ে নিলো আমার সামনে থেকে।

ওরাই কথাবার্তা বলতে লাগলো। আমি চুপ করে বসে রইলাম। মেয়েটি আমার দিকে তাকালোও না।

কিছুক্ষণ পর সেই চোয়াড়ে দেখতে লোকটি ভেতরে উঁকি মেরে বললো, "দিদিমণি, একজন বাবু এয়েছেন।"

"একটু দাঁড়াতে বল।"

আমরা উঠে পড়লাম। মেয়েটি বাইরে বেরিয়ে এলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। আমি তাকিয়ে দেখি কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক, তার বয়েসও পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের কম নয়। মনে মনে ভাবলাম, বাঃ, এদের বাবুরা কি সব ওই বয়েসের?

"আবার এসো দাদা," মেয়েটি বললো অতনুকে। আমায় কিছু বললো না, শুধু আমার দিকে ফিরে ছোট্টো একটু নমস্কার করলো।

আমরা এগিয়ে গেলাম। বাইরের সেই বয়স্ক লোকটা আমাদের পেরিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। সিঁড়ির কাছে গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখি মেয়েটির মুখের উপর সেই গেরস্ত-বাড়ির মেয়ের স্নিগ্ধ মুখশ্রী আর নেই। এক মুহূর্তে সে ভাব অন্তর্হিত হয়ে তার জায়গায় ফুটে উঠেছে এ-পাড়ার মেয়ের পেশাদারী মুখোস। আমার মন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলো।

"ওদিকে আর ফিরে তাকাসনে," বললো অতনু, "চল তোকে বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে আসি।"

অনেকক্ষণ পথ চললাম দুজনে। হঠাৎ এক সময় সে বললে, "এখানে প্রত্যেক মেয়ের জীবনের ঘটনা নিয়ে একটি করে উপন্যাস লেখা যায়। আমি তো ছবির মধ্যে ওদেরই গল্প বলার চেষ্টা করছি।"

সুজাতাদিকে আমি কোনোদিন জানাইনি যে অতনুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেও কোনোদিন আমায় জিজ্ঞেস করেনি অতনুর কথা। চেনাশোনারা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো,—সুজাতা কি বিয়ে-টিয়ে করবে না। এসব কথা সুজাতাদির কানেও যেতো, কিন্তু কোনোদিন ভ্রূক্ষেপ করেনি। সে ওর বাবাকেও কি বুঝিয়েছিলো কে জানে, উনিও সুজাতাদির বিয়ের চেষ্টা করতেন না একেবারেই। কেউ কোনো কথা পাড়লে এড়িয়েই যেতেন। তবে ওঁর ইচ্ছে ছিলো সুজাতাদি অক্সফোর্ডে গিয়ে পড়াশুনো করুক। কিন্তু সুজাতাদির তাতেও অনিচ্ছা। কলকাতায় একটি মেয়েদের কলেজে প্রফেসারি যোগাড় করে নিলো সে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে ডক্টরেটের জন্যে রিসার্চ করতে শুরু করলো।

একদিন হঠাৎ সুজাতাদি আমায় জিজ্ঞেস করলো, "অতনুর খবর রাখো ?"

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন, কি ব্যাপার ?"

"অতনু ল্যান্সডাউনের কাছে এক জায়গায় ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। ওর মতিগতি ফিরেছে মনে হচ্ছে। শুনলাম ও নাকি আর্টিস্ট্রি হাউসে ছবির একজিবিশান করবার চেষ্টা করছে।"

অতনু আমার যতো অন্তরঙ্গই হোক, সুজাতাদির মুখে অতনুর উল্লেখ আমার ভালো লাগতো না। সে তোমার জন্যে একটুও মাথা ঘামায় না,—আমি মনে মনে বলতাম,—তার জন্যে কেন তোমার এখনো এই নিরর্থক অনুরাগ ? যতোই নিস্পৃহ ভাবে তার উল্লেখ করুক সুজাতাদি, কথার মধ্যে যতোই শ্লেষের ভান থাকুক, তার অন্তরের কথা বুঝতে আমার বাকী থাকতো না।

"মতিগতি ওর কোনোদিনই খারাপ ছিলো না সুজাতাদি," আমি বললাম, "ও যা করে, ছবি আঁকবার জন্যেই করে।"

"ছবি আঁকবার জন্যে!" সুজাতাদি একটা ওজন করা হাসি হাসলো, "যে পর্যায়ের ছবি আঁকবার প্রতিভা তার মধ্যে আছে, সে

কি ও কোনোদিন আঁকতে পারবে? আমার তা মনে হয় না। ও নিজেকে নষ্ট করছে খামখেয়ালীপনা করে।”

তোমার কি আসে যায় তাতে,—আমি মনে মনে বললাম। সুজাতাদি জানলো না যে আমার সারা শরীর জ্বলে উঠলো,—আমি অতনুর বন্ধু বলে নয়, আমি সুজাতাদির বন্ধু বলে।

সুজাতাদি যাই বলুক, অতনু মজুমদারের এবারের ছবিগুলো রসিক সমাজের সার্বজনীন প্রশংসা অর্জন করলো ডিসেম্বর মাসের প্রদর্শনীতে।

আশ্চর্য সুন্দর প্রাণময় মনে হোলো তার ছবিগুলো। অসমাপ্ত, অস্পষ্ট তুলির টান, সব ছবিতেই যেন কুয়াশাময় পরিবেশ। ছবির বর্ণবিন্যাসও অত্যন্ত হাল্কা। সব ছবিরই বিষয়বস্তু রাতের কলকাতা। বিভিন্ন অসামাজিক, অনৈতিক পরিবেশের ছবি। অদ্ভুত জোরালো তার আঙ্গিক, অনন্যসাধারণ ভাবগম্ভীর তার বিষয়বস্তুর পরিবেশনা, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে একটা বেদনার অভিব্যঞ্জনা,—মানুষের অশান্ত আত্মা যেন ইতিহাসের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে।

খানিকটা এ ধরনের ছবি এঁকেছিলো তুলুস লোত্রেক, কিন্তু অতনুর ছবির আঙ্গিক, ছবির আত্মিক ব্যাকুলতা, একেবারে তার নিজস্ব। তার ঐতিহ্যের ভিত একেবারে ভারতীয়, তার ছবির জীবনবাদ একেবারে আমাদের দেশের মাটির।

শুনেছিলাম সুজাতাদিও দেখতে গিয়েছিলো সেই চিত্রপ্রদর্শনী। কিন্তু অতনুর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সুজাতাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই সে নাকি গা-ঢাকা দিয়েছিলো।

আমায় একথা বললে সুরজিত। ইদানিং তার সঙ্গে অতনুর আর তেমন মাখামাখি ছিলো না বটে কিন্তু অতনুর প্রতিভার উপর তার শ্রদ্ধা একটুও কমেনি। সে কেতকীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো একজিবিশান দেখতে।

সুরজিত যখন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছিলো, কেতকী আমায় চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো,—"এবারের ছবিগুলো কিরকম লাগছে?"

"খুব ভালো। একেবারে নতুন ধরনের। অতনুদার শৈলী এবং ভাবগভীরতা এই দু-বছরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"

কেতকী আস্তে আস্তে বললো, "আমি জানতাম অতনুদা এবার খুব সুন্দর, খুব ভালো ছবি আঁকবে।"

কেটে গেল তিন মাস, চার মাস, পাঁচ মাস। অতনু পড়ে রইলো তার ব্যক্তিগত জীবনের আবর্তে। আবার কিছু পয়সা এসেছিলো ওর হাতে। পুরোনো বন্ধু সেই অধ্যাপক, প্রবন্ধকার, গবেষক পণ্ডিত সব ইণ্টালেকচুয়াল বন্ধু সবাই আবার তার জীবনে ফিরে এলো। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সকালবেলা যদি অতনুদার ওখানে গিয়ে পড়তাম, দেখতে পেতাম এদের অনেককেই, সবাই মিলে হৈ-চৈ করে বুদ্ধিবাদের তুফান তুলছে চায়ের পেয়ালায়। যার যার নিজস্ব বৃত্তিতে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নাম আছে, এবং সেই খ্যাতির পরিমাণ খুব বেশী নয় বলে বড্ড বেশী আত্মসচেতন। সত্যিকারের সর্বজন-স্বীকৃত খ্যাতিমানদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার হয়েছে ছু-চারবার। তাঁদের কাছে খুব সহজ বোধ করেছি, তাঁরা যে আমার মতো সাধারণ লোকের চাইতে অনেক অনেক অনেক উঁচুতে, এমন কোনো হাবভাব তাঁদের কথাবার্তা আচার ব্যবহারে পাইনি, যদিও তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সে কথা ভুলে থাকা এক মুহূর্তের জন্যেও সম্ভব নয়। কিন্তু যাদের অল্প খ্যাতি, তাদের মধ্যে যখনই এসে পড়েছি, অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করেছি। আমার মতো সামান্য লোকের সংস্পর্শে এলে এরা যেন সজাগ হয়ে ওঠে যে এরা খ্যাতিমান, যদি আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যাই সে কথা, সে ভয়ে কথায় কথায় আমাদের সজাগ করিয়ে দেয়। অন্যের কথা শোনবার ধৈর্য এদের নেই, নিজের কথা একটানা অনর্গল বলে যেতে রুচিতে বাধে না।

এদের কাছে ছুনিয়ার কেউ কিছু নয়। অমুকের কবিতা কবিতা

নয়, অমুকের ছবি ছবি নয়, অমুক ঔপন্যাসিক উপন্যাস লিখতে জানে না, অমুক ঐতিহাসিক ইতিহাসের কিছু জানেন না, অমুক সায়েন্টিস্টের কোনো মৌলিক অবদান নেই, অমুক গণনেতা আসলে দেশের শত্রু, দেশকে ডুবিয়ে দিচ্ছে নিজের নির্বোধ নীতিতে। তাদের মুখে শুনতে পাবেন, আজকের দিনের সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছুর মান অত্যন্ত নীচস্থ, সব কিছুর ভবিষ্যত অত্যন্ত নৈরাশ্যময়। তাদের ধারণা এই বর্তমান কালে চতুর্দিকে শুধ্ চিন্তা ও ভাবের দৈন্য, তাই যাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের উচ্চ ধারণা, তাদের সম্বন্ধে এদের প্রবল সবাক অবজ্ঞা। এদের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক, কারণ নানা মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যের দরুণ এদের চিন্তায় প্রথম আসে সিদ্ধান্ত, তারপর ফরিয়াদী পক্ষের উকিলের মতো সেই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বোনা হয় নানাবিধ যুক্তির জাল। এদের বোঝানো অসম্ভব যে মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর মতো একটি মহান শতাব্দী খুব বেশী আসেনি, এই শতাব্দী হোলো আত্মিক ও পার্থিব বৈভবের অপরিমিতিতে ঐশ্বর্যময় এক আসন্ন মহাযুগের সূচনা। মহাবিপ্লবের প্রাণ-প্রাচুর্যে এ শতাব্দীর জীবন তাই এত উত্তরঙ্গ, বিভিন্নমুখী চিন্তা ও কর্মধারার জটিলতায় এ শতাব্দীর মানুষের মনে সাময়িক ভাবে নিঃসহায় বিভ্রান্তি এলেও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। এ মহাজীবনের সমুদ্র-মন্থনে একদা অমৃত পাওয়া যাবে বলেই গরল নিসৃত হচ্ছে তার আগে, সেই গরল কণ্ঠে ধারণ করে তাই নীলকণ্ঠ হতে হচ্ছে এ যুগের সাধারণ মানুষকে। সে শিব ও সুন্দর বলেই এই গরল তার অমরত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারবে না। তার পুরুষ-রূপ বৈভববিহীন নির্বসন শ্মশানচারী ভিখারী, কিন্তু তার প্রকৃতি-সত্তা এই বিশ্ববৈভবের ঐশ্বর্যময়ী অধীশ্বরী। তারই একাগ্রচিত্ত অনন্ত সাধনার বস্তুতান্ত্রিক প্রকাশ হোলো ইতিহাসের প্রবাহ, যেটা এত ঝঞ্চা-বিপর্যয়ের মধ্যে ঠিক তার নিজের পথ করে মানুষকে নিয়ে চলেছে এক সত্যযুগের দিকে।

এদের 'ইণ্টালেক্চুয়্যাল' মনের চারদিকে বুদ্ধির প্রাচীর, মনের চোখ তাই সেই বাধা অতিক্রম করে শ্যামল জীবনের দিগন্তবিস্তৃত পরিব্যাপ্তিকে অবলোকন করতে পারে না।

এসব আমার কথা নয়, অতনুর কথা। ওকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম,—এদের সহ্য করো কি করে? সে উত্তর দিয়েছিলো,—ওদের দরকার হয়। পিঠের উপর পা রেখে দাঁড়ানোর জন্যেই ওদের দরকার। এ যুগের শিল্পী নিঃসঙ্গ হলে নিঃসহায় হয়ে পড়ে, তাই নিজের চারদিকে একটা স্তাবক-বৃত্ত থাকা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এরা 'ফ্রী' চা পায় দুবেলা, আড্ডা মারবার একটা বাঁধা জায়গা পায়, উপলক্ষ বিশেষে 'ফ্রী' হুইস্কি পায়, সুতরাং অতনুর ঢাক বাজায় এরা। এদের অতনু সহ্য করতো, নীরবে উপভোগ করতো ওদের আলোচনা। এদের স্বরূপ অতনুই আমায় একদিন বুঝিয়েছিলো, আর প্রকাশ করেছিলো মানুষের ভবিষ্যতের উপর তার নিজের প্রশ্নবিহীন আশা ও আস্থা।

অতনু তাদের সহ্য করতে পারতো, কিন্তু আমি পারতাম না। তাই অতনুর কাছে এসব ইণ্টালেকচুয়্যালদের যাওয়া-আসা যতো বাড়তে লাগলো ততো কমতে লাগলো আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ।

সুজাতাদি আমায় একদিন জিজ্ঞেস করেছিলো,—অতনুর কাছে নাকি আজকাল অনেকে যায়?

তাইতো শুনেছি,—আমি উত্তর দিলাম।

যায় কেন? কি পায় ওর কাছে?

কি জানি কি পায়,—আমি আস্তে আস্তে বললাম,—তবে জানলা গলে আসা রোদ্দুরের কাছে দাড়ি কামাবার আয়না যা পায়, তার বেশী কিছু নয় বলেই আমার ধারণা।

কেটে গেল আরও কয়টা মাস। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলোর প্রবাহে আমরা ভেসে চললাম আমাদের মতো। অনেকদিন অতনুর সঙ্গে দেখা হয়নি, তার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করবার অবকাশও হয়নি কারো সঙ্গে।

তারপর একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অভাবনীয় ভাবে।

স্বামী অরুণানন্দ এসেছেন কলকাতায়।

সে সময় তাঁর খুব নাম ডাক। কলকাতা পাটনা দিল্লী বম্বেতে তাঁর অসংখ্য শিষ্য। তাঁর কাছে যাতায়াত করে জজ ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেন্ট অফিসার আর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী। নানারকম অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় তাঁর যোগলব্ধ বিভূতি সম্বন্ধে।

কোন এক ভক্তের ছেলে আলপিন খেয়ে ফেলেছিলো। ডাক্তার এক্স-রে করে বললো অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করতে হবে। স্বামী অরুণানন্দ তাকে নিজের পাদোদক পান করালেন। আবার এক্স-রে করে দেখা গেল, আলপিনের নাকি চিহ্নমাত্র নেই। আরেকজনের স্ত্রীর প্রসবের সময় গাইনিকলজিস্ট্ বললো "সিজারিয়ান" করাতে হবে, তা নইলে প্রাণসংশয়। স্বামী অরুণানন্দের দেওয়া প্রসাদী ফুল রেখে দেওয়া হোলো প্রসব-শয্যায়। পুত্ররত্ন নির্বিঘ্নে স্বাভাবিকভাবে প্রসূত হোলো। কোনো এক রায়বাহাদুরের অন্তিম সময় উপস্থিত হতে তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিলো। অরুণানন্দ এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল, যমের দুয়ার থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন রায়বাহাদুর। তাঁর কৃপায় তাঁর অনুরাগী ভক্তদের মধ্যে "আনএমপ্লয়মেণ্ট স্ট্যাটিস্টিক্স্" একেবারে শূন্য। তাঁর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন থার্ড ক্লাস এম-এ এক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট হয়ে এসেছে।

একদিন তাঁর এক ভক্তের মাদ্রাজ যাওয়ার কথা। ট্রেনে সীট রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। তিনি এসে উপস্থিত হলেন হঠাৎ, বললেন,

আজ যাস নে। ভক্ত থেকে গেল। পরে খবর এলো পথে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে। যেই কম্পার্টমেণ্টে ভক্তের সীট রিজার্ভ করা ছিলো, সেটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। একজনের বাড়ির চাকর গিন্নির গয়নার বাক্স নিয়ে উধাও হোলো। পুলিস কোনো কিনারা করতে পারলো না। স্মিত বদনে সে কথা শুনলেন স্বামিজী, অভয় দিলেন ভক্তকে। দুদিন পরে সেই তস্কর ভৃত্য নিজে এসে গয়নার বাক্স ফিরিয়ে দিলো। তাঁর সামনে বসে একদিন একজন তাঁর কথা শুনতে শুনতে একটা অন্যায় বৈষয়িক চিন্তা করছিলো। স্বামিজী নাকি তাকে হঠাৎ চেপে ধরলেন,—কী, এখানে বসে তুই মনে মনে অফিসের ক্যাশ ভেঙে রেসের ঘোড়ার উপর বাজী ধরবার চেষ্টা করছিস? সে লোকটা পাপ স্বীকার করে অশ্রুসিক্ত লোচনে তাঁর শ্রীচরণে পতিত হোলো। স্বামিজী দয়াপরবশ হয়ে বললেন,—আচ্ছা কাল সাড়ে দশটার থেকে পৌনে বারোটার মধ্যে তুই লটারীর টিকিট কিনিস। সে লোকটি নির্বিচারে তাই করলো, এবং যথাকালে লটারীতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে কলকাতায় নিজের দু'খানা বাড়ি করলো।

এমনিতরো সব নানা রকম কাহিনী। লোকে যতো বেশী শুনলো ততো বেশী করে ভিড় করতে লাগলো তাঁর কাছে এসে। তাঁর অতি সুন্দর সৌম্য প্রশান্ত অভিজাত অতিভুক্ত চেহারা দেখে কেউ মনে করতে পারে না যে এসব কাহিনীর মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন আছে, কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে না এসব কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে। বিলাস ব্যসনে তাঁর চরম অনাসক্তি, সেকথা নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করেন সর্বসময়ে, তবু ভক্তেরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তাকে অত্যন্ত রাজসিক পরিবেশের মধ্যে রাখে সব সময়।

তাঁর প্রধানা সেবিকা অমিতা দেবী অপরূপ সুন্দরী। তাঁকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে সবাই। স্বামিজী নাকি তাঁর সাধনার ফলাফল অমিতা দেবীর হাতে তুলে দিয়েছেন। ছেলে বুড়ো সবাই কোনোরকম দ্বিধা না করে তাঁর পায়ের ধুলো নেয়।

সেবার স্বামী অরুণানন্দ কলকাতায় এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে। তিনি এসে আমাদের সবাইকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন।

স্বামী অরুণানন্দের সম্বন্ধে এত গল্প শুনেছি যে, খুব কৌতূহলের সঙ্গে একদিন দেখতে গেলাম তাঁকে।

ঘরের মধ্যে দামী গালচে পাতা। ধূপ আর রজনীগন্ধার গন্ধে একটা জমজমাট সাত্ত্বিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে একটি চওড়া ডিভ্যান। সেখানে ডানলোপিলোর গদির উপর পেতে দেওয়া হয়েছে ব্যাঘ্রচর্ম। তার উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে স্বামী অরুণানন্দ ভক্তদের শোনাচ্ছেন তাঁর অমৃতবাণী। নিচে একপাশে হরিণের চামড়ার আসনে বসে আছেন তাঁর প্রধানা শিষ্যা অমিতা দেবী।

খুব বিমুগ্ধ হয়ে দেখলাম অমিতা দেবীকে। পাকা সোনার মতো গায়ের রং, টিকল নাক, ডালিমের দানার মতো রাঙা ঠোঁট, পদ্মপলাশ নয়ন। বাদামী জটা, কিন্তু দু-হাত ভর্তি গহনা, পরনে খুব দামী বেনারসী সিল্ক।

তারপরই যার উপর চোখ পড়লো, তাকে দেখে চমকে উঠলাম।

সামনের সারিতে চোখ বুঁজে বসে আছে অতনু মজুমদার। পরনে ধবধবে সাদা খদ্দর, গায়ে সিল্কের নামাবলী। চোখে-মুখে একটা আশ্চর্য সমাহিত প্রশান্তি।

ঘণ্টাখানেক পর স্বামী অরুণানন্দের ধর্মোপদেশ সমাপ্ত হোলো। সবার প্রণাম গ্রহণ করে তিনি ভেতরে বিশ্রাম করতে চলে গেলেন। তাঁর অনুগমন করলো অমিতা দেবী। ভক্তেরা বসে রইলো প্রসাদের জন্যে।

আমি এগিয়ে অতনুর পাশে এসে বসলাম।

সে ফিরে তাকালো আমার দিকে। জিজ্ঞেস করলো, "তুই এখানে?"

"আমিও তো তোমায় ওই একই প্রশ্নই করতে যাচ্ছিলাম।"

অতনু হাসলো। বললো, "আমায় এখানে দেখে খুব অবাক হয়ে গেছিস, না?"

"এখানে আমায় দেখে তুমি যতোটা অবাক হয়েছো তার বেশী নয়," আমি উত্তর দিলাম, "তবে ঠিক এরকম জায়গায় যে দেখা হবে সেটা আশা করিনি।"

একটু চুপ করে রইলো অতনু। তারপর বললো, "মহারাজের কাছে এসে একটা শান্তি পাই, যেটা এ পর্যন্ত আর কোথাও পাইনি। ভালো লাগে। ওঁর সংস্পর্শে আসবার পর মনের একটা স্থিরতা এসেছে। আমি আমার ছবি আঁকার মধ্যে যা এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তার যে সন্ধান আছে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে, সে কথা তো আমায় আগে কেউ বলে দেয়নি। গুরুদেব আমায় বললেন,—তুমি যা খুঁজছো, আমি তোমায় পাইয়ে দেবো। তুমি আমার কাছে এসো, তুমি শুধু তোমার হৃদয় মন যথাসর্বস্ব আমায় নিবেদন করো।—ওঁর কথা শুনে এক নিমেষে আমার মনের সমস্ত সংশয় মুছে গেল, ওঁর করস্পর্শে মুছে গেল আমার দেহের ও মনের সমস্ত ক্লেদ। তিনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন, যেই জীবন-দেবতার স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে আছি; তাঁকে তো বাইরের এই মোহমায়াময় বস্তুতান্ত্রিক জীবনে খুঁজে পাবো না, তাঁকে খুঁজে পাবো আমার অন্তর্জীবনে। পরমার্থের সন্ধান পেতে হলে যে অধ্যাত্মবাদের পথ ছাড়া আর অন্য পথ নেই, একথাই আমায় শিখিয়ে দিলেন আমার গুরুদেব।"

অরুণানন্দের সঙ্গে অতনুর এই যোগাযোগ অনেকের পছন্দ হয়নি।

ওর সাম্প্রতিক জীবনের কথা দু চারজন গুরুদেবের কানে তুলেছিলো। ওঁর কাছে সব অকপটে স্বীকারও করেছিলো অতনু। বলেছিলো,—আমার মধ্যে তমোভাব অতি প্রবল, আমি কামকীট, আমায় উদ্ধার করুন।

গুরু মহারাজ অভয় দিলেন অতনুকে। বললেন,—কেন নিজেকে হীন ভাবছো এর জন্যে? গীতায় বিভূতিযোগ অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ নিজের বিভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন,—প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ,—আমি প্রাণিগণের প্রজনন শক্তি কাম। ওটা সৃজনী শক্তির উৎস। তুমি শিল্পী, তুমি সৃজনীকার, তাই সে শক্তির প্রবল আলোড়ন তোমার অন্তরের মধ্যে। কিন্তু তোমার চারদিকে তমোভাবের অন্ধকার, তাই তোমার মনে এই গ্লানি। নিজেকে উপলব্ধি করো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উর্ধ্বে উঠে সেই পরম রসের সন্ধান খুঁজে নাও, পাপ পুণ্য তখন শিল্পীর কাছে সব একাকার হয়ে যাবে।

ঘরের মধ্যে তখন বেশী কেউ আর ছিলো না। অতনু বলে যাচ্ছিলো, আমি শুনছিলাম চুপচাপ।

এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, "অতনুদা, ছবি আঁকছো তো? না কি ছেড়ে দিয়েছো?"

"না ভাই। ছবি আঁকা ছেড়ে দেব কেমন করে? ছবির মধ্যে আমি এক নতুন রসের সন্ধান পেয়েছি। আমায় প্রেরণা দিয়েছেন আমার গুরুদেব। ওই ছাখ, আজকাল কি ছবি আমি আঁকছি। ওটা আমি গুরুদেবের শ্রীচরণে উপহার দিয়েছি।"

তাকিয়ে দেখলাম, ঘরের কোণে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো আছে একটি তেলরং ছবি। ফ্রেম জুড়ে রঙের বাহার, কিন্তু আকৃতিগুলো আবছায়া, কিছু পরিস্কার বুঝতে পারলাম না।

"ওটা কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"শিব ও অন্নপূর্ণা। ওই যে ওদিকে দেখছিস, উনি অন্নপূর্ণা।

শিব ভিক্ষাপাত্র হাতে মায়ের সামনে দাঁড়িয়েছেন, মা অন্নপূর্ণা তাঁর পাত্র ভরে অন্নদান করছেন।"

আমাদের পৌরাণিক ছবি রক্ষণশীল আঙ্গিকে দেখতেই আমি অভ্যস্ত। শিব ও অন্নপূর্ণার এই "মডার্নিস্টিক ট্রিটমেণ্ট" মনে একটা ধাক্কা দিলো। ছবি দেখে আমার প্রথমটা মনে হয়েছিলো এ একটা জলপ্রপাতের দৃশ্য, ওপরে একটা পাথরের চাঁই, নিচে একটা, নিচের পাথরের চাঁই-এর উপর একটি পাখির বাসা। পাথরের গায়ে তিনটে চোখ দেখে আমি বিশেষ কিছু ভাবিনি, স্যালভাডর ডালির ছবি দেখবার পর আর কোনো দুর্বোধ্য অস্বাভাবিকতাতেই বিস্ময় হয় না। কিন্তু এই ছবি যে শিব ও অন্নপূর্ণার, একথা শুনে সত্যিই অবাক হলাম।

অতনু বোধ হয় আমার মনেব ভাব বুঝলো। বললো, "দ্যাখ, আধ্যাত্মিক ছবি আঁকতে হলে ক্লাসিক্যাল পদ্ধতিতে আর চলবে না। ওই পদ্ধতিতে চেষ্টা করা হয় রেখার মধ্যে সমস্ত অনুভূতিকে সীমিত করবার, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করবার। যা ইন্দ্রিয়াতীত, তার কোনো প্রতিরূপ দেওয়া যায় না। এজন্যেই আমরা ছবিতে দেখি লক্ষ্মী সরস্বতী দুটি সুন্দর মেয়ে, গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ওরকম অনেক দেখা যায়। কৃষ্ণ একটি ভারী সুন্দর সুঠাম ছেলে, যাকে দেখলে মনে পড়ে গাঁয়ের পাঠশালার দুষ্টু ছেলেদের কথা। রাধা একটি মিষ্টি গ্রাম্য কিশোরী, যার মতো চোখ দেখা যায় পল্লীগ্রামের অনেক পুকুরঘাটের আশেপাশে। কিন্তু এরকম হবে কেন? রাধা, কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, দুর্গা, এঁরা সব এক একটা ভাবরূপ, তাকে প্রকাশ করতে হলে তো শুধু রেখার সীমানার মধ্যে পড়ে থাকলে চলবে না। যে কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তাঁকে আঁকতে হলে তো ছবি ফর্ম-সর্বস্ব হলে চলবে না।"

আমি একটু হাসলাম। বটতলার মহাভারতে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ছবি মনে পড়লো,—কোমল পেলব কৃষ্ণ হাঁ করে আছে, মুখের মধ্যে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের রেখাসমন্বিত একটি ভূগোলক।

অতনু নিজের মনে বলে গেল, "ওভাবে ঠাকুর দেবতার ছবি এঁকে তো আমার অন্তরের মধ্যে সেই পরমারাধ্যকে দেখতে পাবো না, কারণ ওই পদ্ধতিতে ছবি এঁকে আসলে আমরা পরমারাধ্যের মধ্যে নিজেকে দেখবার চেষ্টা করি। না হয় তাই, তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু ভাই, ওখানেই থেমে থাকলে তো চলবে না, আরো এগোতে হবে। আমার মধ্যে সেই পরমারাধ্যকে পেতে হবে। ছবির মাধ্যমে সেই উপলব্ধিকে পেতে হলে চাই নতুন আঙ্গিক, নতুন রীতি। পুরোনোতে চলবে না। যে ইন্দ্রিয়াতীতকে চর্মচক্ষু দিয়ে বুঝতে পারবো না, দেখতে হবে মনের চোখ দিয়ে, তাকে রঙে রেখায় আলো-ছায়ায় পেতে হলে চাই নতুন টেকনিক। সেই নতুন টেকনিক খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে এ-যুগের শিল্পীরা, ইম্প্রেশানিস্ট, পোস্ট্-ইম্প্রেশানিস্ট, কিউবিস্ট, এক্সপ্রেশানিস্ট, এদের উদ্যমের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে বিবর্তিত হয়ে রূপ নিচ্ছে সেই নতুন চিত্ররীতি। কিন্তু এরা বেদনা-সচেতন, সংঘাত-সচেতন,—তার বেশী কিছু নয়। তাই এদের ছবি টেকনিক-সর্বস্ব এবং দুর্বোধ্য। তাই এরা ডেকাডেন্ট, ক্ষয়িষ্ণু। এরা এদের সমাজব্যবস্থারই ফসল। সুতরাং ওদের অনুকরণ করলে চলবে না। ওদের অনুসরণ করে, ওরা যেখানে থেমে যাচ্ছে, সেখানে ওদের পেরিয়ে আরো এগিয়ে যেতে হবে।"

আমি চুপচাপ শুনলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ছবি এঁরা বুঝতে পারেন?"

"গুরু মহারাজ পারেন," অতনু উত্তর দিলো, "আর পারেন অমিতা দেবী। প্রথম দিকে গুরুদেবও আমার ছবি পছন্দ করতেন না, কিন্তু অমিতা দেবী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। অমিতা দেবী ভাব-সাধিকা, তাঁর একটা আশ্চর্য চোখ আছে। তিনি বুঝিয়ে দিতে গুরুমহারাজও বুঝলেন, উপলব্ধি করলেন, আশীর্বাদ করলেন, বললেন,—বাবা, তুমি যা খুঁজছো, শীঘ্রই পেয়ে যাবে। তুমি ভেবো না বাবা, আমি তোমায় দীক্ষা দেবো।"

"গুরুমহারাজের অন্যান্য ভক্ত শিষ্যরা কি বলেন," আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ওরা কী বুঝবে আমার ছবির? সব নিরেট গাধা। ওরা গুরুমহারাজের কাছে আসে কামনা নিয়ে। উনি ওদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করেন মাত্র।"

"তোমার স্টুডিও কোথায় করেছো অতনুদা?"

এবার একটা খুব অভিজাত অঞ্চলের ঠিকানা পেলাম। বুঝলাম, গুরুমহারাজের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে অতনু মজুমদারের বরাত খুলে গেছে। এটাই হোলো আসল কথা। গুরুমহারাজ অতনুর ছবি পছন্দ করেন বলে তাঁর ভক্ত শিষ্যরা সবাই ওর ছবি কিনতে আরম্ভ করেছে; এবং কিনছে খুব ভালো দাম দিয়ে। এই মুহূর্তেই নাকি হাতে অর্ডার আছে চল্লিশটা আধ্যাত্মিক ছবির। এক-একটা ছবির দাম দেড়শো দুশো তিনশো করে।

বাঃ,—আমি মনে মনে বাহবা দিলাম অতনুকে। পয়সা করবার ভালো রাস্তা ধরেছে এবার।

"একদিন আসিস আমার স্টুডিওতে," যাওয়ার সময় অতনু বললো।

গেলাম একদিন।—ভেতরে গিয়ে দেখি অমিতা দেবী এসেছেন ছবি দেখতে। অতনুদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। উনি একটু মধুর হাসি হাসলেন। এত মিষ্টি সেই হাসি যে দশ পেগ্ হুইস্কির নেশার মতো আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগলো।

অথচ আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। চাল চলনে একটা মধুর গাং

কয়েকদিন পরে আরেকদিন গেলাম। যখন ঢুকছি, তখন দেখি অমিতা দেবী বেরিয়ে আসছেন।

আরেকদিন।—

আমি যখন বেরিয়ে আসছি, দেখতে পেলাম অমিতা দেবী স্টুডিওর সামনে অবতরণ করছেন গাড়ি থেকে।

সুজাতাদি আমায় একদিন জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, পরিমল, ওই অমিতা দেবীটি কে?"

"স্বামী অরুণানন্দের প্রধানা শিষ্যা ও সেবিকা।"

"ও—।" সুজাতাদি চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "শুনেছি, অপরূপ সুন্দরী।"

এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিলাম না। শুধু বললাম যে, অমিতা দেবী খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভদ্রমহিলা, সবাই শ্রদ্ধা করে। আমার কথা শুনে আদিম নারীর একটা মুখ-ভাব ফুটে উঠলো সুজাতাদির মুখে। আর কিছু বললো না।

আস্তে আস্তে অনেকেই দু-চার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো অমিতা দেবী আর অতনু মজুমদারের সম্বন্ধে। একদিন কথা হচ্ছিলো সুরজিতের ওখানেও।

কেতকী তখন রাধাকৃষ্ণের একটি ছোটো মূর্তির পাশে একটি পুষ্পপাত্রে তিনটি কদম ফুলের একটি জাপানী-আঙ্গিকের বিন্যাস সাজাবার চেষ্টা করছিলো। হঠাৎ এদিকে ফিরে বললো, "কেন তোমরা এসব কথা আলোচনা করছো? অতনুদা ছবি তো আঁকছে। তাই যথেষ্ট। এভাবে আঁকতে আঁকতেই যা খুঁজে মরছে, একদিন পেয়ে যাবে। এক একজন ওকে এক এক সময় এক এক রকম প্রেরণা দেয়। শিল্পী তার অন্তরজীবনে কার কাছ থেকে কি পায় সেটা বোঝা যায় না বাইরের সম্পর্ক আর আচরণ দেখে। ওসব বুঝবার চেষ্টা না করাই ভালো, কারণ আসল কথাটা বোঝা যায় না, শুধু ভুল বোঝা হয় মাঝখান থেকে। অতনুদা জীবনে যাই করুক, আমার কিছু বলবার নেই। ও ভালো ছবি আঁকলেই আমি খুশী।

সে গেরুয়াবস্ত্র পরিধান করে ছবি আঁকছে, না উত্তর কলকাতার অগম্য অঞ্চলে বসে ছবি আঁকছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই।”

তারপর একদিন একটি সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো সেই সন্ধ্যার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে।

সেদিন অতনুর ওখানে গেছি।

দরজা ছিলো বন্ধ। কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিলো অতনুদা। বললে, “ও, তুই? আয়, ভেতরে আয়।”

গেলাম ভেতরে। যে ছবিটা ও আঁকছিলো সেটি ঈজেলের উপর পেছন ফিরিয়ে উল্টে রাখা। আমি চারদিকে ঘুরে ঘুরে অন্য ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। হীটার জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপালো অতনুদা।

তারপর চা খেতে খেতে নানারকম গল্প।

কথাবার্তা প্রায়ই এক তরফা। অতনু বক্তা, আমি শ্রোতা। সে আমায় প্যারিসের গল্প শোনালো, লেফ্‌ট্‌ ব্যাঙ্ক আর্টিস্টদের গল্প শোনালো। ম্যাক্স আর্নস্ট, জোন মিরো, জর্জিও দ্য চিরিকো, আঁরি রুসো, মার্সেল দুশোঁ, আমিদিও মোদিগ্‌লিয়ানি, এদের ছবি আলোচনা করতে করতে হঠাৎ চলে গেল চারশো বছর আগেকার শিল্পী এল্‌-গ্রীকোর প্রসঙ্গে। তারপর হঠাৎ তাকে ছেড়ে ফ্রান্সিস্‌কো গোয়ার জীবনকাহিনী শোনাতে শুরু করলো।

বললো, “এই একটি আশ্চর্য শিল্পী। অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, কিন্তু এখনকার শিল্পীদের উপরও ওঁর খুব প্রভাব। উনিই প্রথম, যিনি গণবিপ্লবের মধ্যে থেকে ছবির বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন। তবে আমায় খুব অভিভূত করে ওঁর সেই বিখ্যাত ছবি,—La Maja Desnuda বা the naked Maja, ওটা দেখেছিস?”

দরজাটা খোলা ছিলো। বাইরে কখন একটা ঝকঝকে গাড়ি এসে থেমেছে আমরা খেয়াল করিনি। কতো গাড়ি আসছে যাচ্ছে এ পথ দিয়ে, এখানে থামছে, ওখানে থামছে!

হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন স্বামী অরুণানন্দ। সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত পার্ষদ।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

"তোমার ছবি দেখতে এলাম," বললেন গুরু মহারাজ, "কই হে, দেখাও নতুন কি ছবি এঁকেছো," বলে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

অতনু মজুমদারের মুখ দেখে মনে হোলো না যে, সে খুব পুলকিত হয়েছে তার গুরুদেবের এই আকস্মিক আবির্ভাবে। বললো, "বসুন।"

অরুণানন্দ বসলেন না। হঠাৎ এগিয়ে গেলেন ঈজেলের দিকে। অতনু তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল, কিন্তু তার আগেই তিনি উল্টে রাখা ছবিখানি তুলে এদিকে ফেরালেন।

খুব স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম একটা আশ্চর্য ছবি। বেশ বড়ো, ছ-ফুট আর চার ফুট।—

ডিভ্যানের উপর শায়িতা এক বিবসনা সুন্দর সুঠাম নারীমূর্তি, তার মুখের সঙ্গে অমিতা দেবীর চেহারার আশ্চর্য মিল। একেবারে রেনেসাঁস যুগের শিল্পগুরুদের রীতিতে আঁকা। কিন্তু পেছনের পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণের ঝাপসা যুগল ছবি, যার অঙ্কনরীতি নিও-ইম্প্রেশানিস্ট, আর চারপাশে কিউবিস্ট ছাঁদে অনন্য বর্ণসজ্জা।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল গোয়ার La Maja Desnuda ছবিখানি।

আর মনে পড়ে গেল আরো অনেক ছবি। বসনবিহীনা নারী দেহ নিয়ে চিত্রকলার ইতিহাসে আঁকা হয়েছে অনেক অপূর্ব অনবদ্য ছবি। অজন্তার দু-নম্বর গুহায় বিবস্ত্রা কিন্তু রত্ন-আভরণ সজ্জিতা অপ্সরা, ষোলো নম্বর গুহার মুমূর্ষু রাজকন্যা, টিটিয়ানের Venus

and the lute player, রোনোয়ার কুরবেত দেগা সেজান এঁদের আঁকা স্নানরতা নারীচিত্র, স্নানরতা বিবসনা রাধার রূপলহরী-বিমুগ্ধ কৃষ্ণের মধ্যযুগের গাড়ওয়াল ছবি, রুসোর the dream, দোমিনিক ইনগ্রের Odalisque, মাতিসের Odalisque with raised arms, মোদিগ্‌লিয়ানির the nude। বিখ্যাত গ্রীকো-রোমান ভাস্কর্য the three graces অবলম্বন করে র‍্যাফেলও এঁকেছিলো the three graces, জিওরজিওনির নিদ্রিতা ভিনাস ছবিখানির বিন্যাসরীতির প্রভাব পড়েছিলো গোয়ার the naked Maja ছবিতে, গোয়ারই মতো আবিষ্ট হয়ে মানেত এঁকেছিলো তার Olympia। প্রত্যেকটা আজ বিশ্বের চিত্রসংগ্রহের অমূল্য সম্পদ।

তাদের প্রত্যেকটি যেন হঠাৎ সমাবিষ্ট হোলো অতনুদার ছবির মধ্যে। যেমনি করে টিটিয়ানের the Venus of Urbino ছবিটির প্রেরণা ছিলো তার বান্ধবী এলিনোরা দ্য গোনজাগা, Maja-র ছবি আঁকতে ফ্রান্সিসকো গোয়া যেমনি আদর্শ করেছিলো তার প্রণয়িনী ডাচেস্ অফ্ আলবাকে, আজ তেমনি অতনুও যেন এক ক্লান্ত উর্বশীর ছবি আঁকলো অমিতা দেবীর মুখখানি নিয়ে। বিবসনা নারীদেহকে প্রতীক করে স্যালভাডর ডালি এঁকেছে the city of drawyers, দ্যু-শোঁ এঁকেছে nude descending a staircase, পিকাসো এঁকেছে the girl before a mirror, এঁকেছে আর রূপময় করে তুলেছে যুগ-মানসের বিভিন্ন সংঘাত এবং জীবনের গতিকে,—কিন্তু অতনুর ছবিতে যেন আকৃতি পেলো মানুষের চিরন্তন সৌন্দর্য-রসিক মনের শান্ত-সমাহিত মহাভাব, তার নেই কোনো রস-বিকৃতি, সে বসনবিহীনা, সে চিরসুন্দর, সে চির-নিবেদিতা তার জীবনদেবতার পায়ে।

কিন্তু স্বামী অরুণানন্দ মহাসাত্ত্বিক। চিত্রকলার ইতিহাস তাঁর জানা নেই। চিত্রকলা বুঝবার, উপলব্ধি করবার, অন্তর নেই। এই বিবসনার সঙ্গে তাঁর প্রধানা শিষ্যা অমিতা দেবীর চেহারার মিল তাঁর

ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। রাগে অন্ধ হয়ে তিনি পাশের টেবিল থেকে কালির বোতল তুলে ছুঁড়ে মারলেন ছবির উপর। একটি পেন্‌সিল কাটবার ছুরি তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা ফালি এঁকে দিলেন সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে।

আর্টের ইতিহাস থেকে একটি বিরাট সম্ভাবনাময় ছবি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কয়েকদিন পরে শুনলাম স্বামী অরুণানন্দ কলকাতা ছেড়ে বাইরে চলে গেছেন অমিতা দেবী এবং অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে।

তারপর একদিন দেখলাম অতনুর স্টুডিও তালাবন্ধ। শুনলাম, অতনু মজুমদার কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে।

"ও আবার পালিয়েছে," বললো সুজাতাদি, এবার কাঁদো-কাঁদো হয়ে। শুনলাম অতনু গেরুয়া ধারণ করে চলে গেছে হিমালয়ে, হরিদ্বার না হৃষীকেশ ওরকম কোথাও। সবারই কিরকম যেন মনে হোলো অতনু আর ফিরবে না।

শুধু কেতকী ফুলদানিতে ফুল সাজাতে সাজাতে বললো, "ওর জন্যে ভেবো না। ও ঠিক ফিরে আসবে। ফিরে না এসে যাবে কোথায়? ওকে যে ছবি আঁকতে হবে। ওর জীবনদেবতাই সব মানুষের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে আসবে। মানুষকে বাদ দিয়ে লোকালয়ের বাইরে কোনো শিল্পী বাঁচতে পারে?"

কেতকী ঠিকই বলেছিলো।

ছ-বছর পরে অতনু মজুমদার ফিরে এলো। তাকে প্রথম যেদিন চৌরঙ্গিতে দেখলাম, প্রথমটা চিনতেই পারিনি। একেবারে নতুন মানুষ। চেহারা খুব সৌম্য, খুব সুন্দর হয়েছে। পরনে খুব ভালো দরজির সেলাইকরা সুট। হাতে দামী সিগারেটের টিন। থুতনিতে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি।

হঠাৎ একদিন বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেলাম। সুরজিত নিজে এসেছিলো নেমন্তন্ন করতে।

অতনুর সঙ্গে কেতকীর বিয়ে!—শুনে খুব খুশী হলাম।

কিরকম যেন হঠাৎ হয়ে গেল। কেতকী এমনি হাল্কাভাবে বলেছিলো—অতনুদা, এবার একটি বিয়ে থা করো।

শুনে অতনু চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলো, "তুমি আমায় বিয়ে করবে কেতকী?"...

"মা একটু খুঁতখুঁত করছিলেন," সুরজিত বললো, "কারণ অতনুদার বয়েস এখন চল্লিশের কাছাকাছি। আর, কেতকীর মোটে তেইশ। যাই হোক, দুজনে যখন নিজেরা ঠিক করে বিয়ে করছে তখন আর কারো কোনো আপত্তির প্রশ্ন ওঠেই না।"

"কিন্তু এ বিয়ে কি টিকবে," সুজাতা খুব অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমায় জিজ্ঞেস করেছিলো।

"কেন টিকবে না? দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসে," আমি বললাম।

"হতেই পারে না," উত্তর দিলো সুজাতা, "অতনুর মনে যদি কোনো ভালোবাসা থাকে, সে শুধু তার ছবির জন্যে।"

সুজাতাদির কথা শুনে আমি চুপ করে রইলাম। কে জানে, হয়তো সুজাতাদির কথাই ঠিক। মেয়েরা অনেক বেশী বোঝে এসব কথা।

সে আনমনা হয়ে বসে ছিলো অন্যদিকে তাকিয়ে। জানতে পারলো না যে আমি নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখছি তাকে। আমার

ভালো লাগছিলো না চুপচাপ বসে থাকতে। জিজ্ঞেস করলাম, "কি ভাবছো, সুজাতাদি? অতনুর কথা?"

"না," সুজাতা মুখ ফিরিয়ে হাসলো, "ভাবছি আমার নিজের কথা।"

"নিজের কথা? কেন, তোমার আবার কি হোলো?"

সুজাতা এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না। নিজের মনে শেক্স্‌পীয়ার উধৃত করলো আস্তে আস্তে:

"I am ashmed that women are so simple
To offer war when they should kneel
for peacc,
Or seek for rule, supremacy, and sway,
When they are bound to serve, love
and obey."

তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, "কে জানে কদ্দিন টিকবে ওদের বিবাহিত জীবন, কিন্তু যেই কদিন টেকে, সেই কদিন কেতকীর সুখের অভাব হবে না।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "আমায় এখন যেতে হবে।"

"এরই মধ্যে?" সুজাতা অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে, আমি তো ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবো।"

আমি শুধু বললাম, "আজ নয়।"

মেয়েদের কাছে মনের চেহারা লুকোনো শক্ত। সুজাতাদি আমার মুখ ‾ বুঝলো কে জানে, একটু চুপ করে থেকে বললো, "আচ্ছা, আবার এসো কোনো একদিন।"

আমি সোজা নেমে চলে এলাম। পেছন ফিরে তাকালাম না।

এর মধ্যে একদিন আমার এক বাচ্চা ভাগ্নীকে নিয়ে চিড়িয়াখানায়

গিয়েছিলাম। বৃহদায়তন এক ভালুক-দম্পতির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে সে কি ভাবলো কে জানে, হঠাৎ বললে,—মামা, তেষ্টা পেয়েছে, কোকাকোলা খাবো।

তাকে নিয়ে যখন চিড়িয়াখানার রেস্তরাঁর দিকে যাচ্ছি,—হঠাৎ দেখতে পেলাম অতনু আর কেতকীকে। ঝিলের ধারে একটি ঝোপের আড়ালে গাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসে আছে।

ওরা হয়তো দেখতে পায়নি আমায়। আমিও ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম না। ওদের এড়িয়ে সোজা পথ ছেড়ে ঘুর-পথে অন্য দিকে চলে গেলাম।

তার পরদিন বেশ মেঘলা। আকাশ থমথমে হয়ে আছে। স্থির করলাম, আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবো না। ডিটেকিটভ উপন্যাস পড়ে কাটিয়ে দেবো সারাদিন।

বৃষ্টি নামলো ঝমঝম করে। বই থেকে চোখ তুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি এগারোটা প্রায় বাজে। খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে নেবো কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজায় ঘন্টি বাজলো।

কে এলো এই অবেলায়? চাকর গিয়ে দরজা খুলে দিলো। ঘাড় বাড়িয়ে দেখি, অতনু ভেজা বর্ষাতির বোতাম খুলছে।

"তুমি?"

সত্যিই অবাক হয়েছিলাম ওকে দেখে। আমার বাড়িতে সে খুব কমই আসতো। সেবার বম্বে থেকে ফিরে অবধি আর আসেনি।

"হ্যাঁ রে, আমি। পথ ভুলে কিনা জানতে চাইছিস?" বলে হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর ঢুকে একটি আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলো, "সকাল বেলা উঠেই তোর কথা মনে পড়লো। স্থির করলাম, তোকে যদি ধরতে পারি, আজকের দিনটা তোর সঙ্গেই কাটাবো। তোর কোথাও যাওয়ার নেই তো?"

"কোথাও না। কোথায় যাবো এই বৃষ্টিতে।"

"কি করছিলি?" বলতে বলতে অতনু ইংরেজী ডিটেকটিভ বইটি তুলে নিলো। "গার্ডনার? তোর হয়ে গেলে আমায় দিস। আমিও এর বই খুব পড়ছি আজকাল। পেরি মেসন আমার খুব ফেভারিট। বরং এটা আজ আমি নিয়েই যাই। তুই পরে পড়িস।"

আমার কোনো আপত্তি কানে না তুলে সে বইখানি পকেটস্থ করলো। তারপর বললো, "চল।"

"কোথায়?"

"বাইরে কোথাও খেয়ে নিই। তারপর কোথাও গিয়ে বসা যাবে। অনেকদিন বসে গল্প করিনি তোর সঙ্গে।"

"কোথায় যাবে এই বৃষ্টিতে?"

একটু ভাবলো অতনু। তারপর বললো, "চল্, আর কোথাও না হয় তো চিড়িয়াখানায় গিয়ে বসা যাবে।"

"চিড়িয়াখানায়?" আমি অবাক হলাম প্রথমটা। তারপর হেসে ফেললাম। বললাম, "সবেমাত্র কাল ঘুরে এলাম চিড়িয়াখানা থেকে। আমার এক বাচ্চা ভাগ্নীকে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

অতনু হেসে বললো, "কাল আমিও একটি বাচ্চাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। তবে, সে আমার ভাগ্নী নয়।"

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আমায় দেখেছো?"

"তুই আমায় যেরকম দেখেছিস, আমিও তোকে সেরকম দেখেছি," অতনু উত্তর দিলো, "তুই না দেখার ভান করে চলে গেলি, আমিও না-দেখার ভান করে বসে রইলাম।"

"কেতকী আমায় দেখতে পেয়েছিলো?"

"না। সে জন্যেই তোকে ডাকিনি। ও লজ্জা পেতো।"

"হ্যাঁ, আমিও সেজন্যে যাইনি তোমার কাছে।"

অতনু আর কিছু বললো না। জানলার কাছে গিয়ে আকাশটা

পর্যবেক্ষণ করে আমার দিকে ফিরে বললো, "বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে। চল, বেরিয়ে পড়ি এই বেলা।"

"বাইরে বেরিয়ে কি হবে? এখানেই তো বেশ আছি। সারাদিন আড্ডা দেওয়া যাবে।"

"বাড়ির এত লোকজনের মধ্যে?"

"কোথায় লোকজন?"

"কেন, বাড়ির অন্য সবাই কোথায়?"

"কেউ নেই। সবাই কলকাতার বাইরে।"

"শুধু তুই একা?"

"হ্যাঁ। আমি আর আমার চাকর।"

"কি রান্না হয়েছে?"

"খিচুড়ি।"

"গ্র্যাণ্ড—!" খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো অতনুর মুখ, "তাহলে আর বাইরে গিয়ে কি হবে? একটা তোয়ালে দে। চানটা সেরে নিই।"

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় এসে দুজনে দুটো ইজিচেয়ার টেনে বসলাম। আমি সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলাম অতনুর দিকে।

"আমি সিগারেট খাই না," অতনু বললো।

"সিগারেট খাও না!" আমি আকাশ থেকে পড়লাম, "কবে থেকে?"

"ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন?"

"কেতকী বলেছে ছেড়ে দিতে।"

অতনুকে দেখেছি সর্বক্ষণ সিগারেট কি চুরুট কি পাইপ একটা না একটা কিছু টানছে। এক সময় সিগারেটের অভাবে বিড়িও

টানতে দেখেছি তাকে। সেই অতনু, যাকে আজ পর্যন্ত কোনো নারী বাঁধতে পারেনি, সে ধূমপান ত্যাগ করেছে কেতকীর এক কথায় ?

অতনু হাসলো আমার বিস্ময় দেখে। আস্তে আস্তে বললো, "আমি কেতকীকে বিয়ে করছি।"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"কার কাছে ?"

"সুজাতাদির কাছে।"

অতনু হেসে ফেললো,—"সুজাতা কি এখনো আমার সব খবর রাখে ?"

রাগ হোলো অতনুর কথা শুনে। সোজা উত্তর না দিয়ে বললাম, "তোমার বন্ধু বান্ধবেরা সবাই তোমার খবর রাখে! শুধু তুমিই কারো খবর রাখো না।"

অতনু একটু হেসে চুপ করে রইলো। সে কি যেন ভাবছিলো অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

আমি সিগারেট ধরালাম। মুষলধার বর্ষণ আর নেই, কিন্তু একেবারে থামে নি। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে একটানা। গলির মোড়ে জল জমেছে।

অতনু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমি বিয়ে করছি শুনে তোরা খুব অবাক হয়েছিস, না ?"

"বিয়ে করছো শুনে যতো না অবাক হয়েছি, তার চাইতে আরো অনেক বেশী অবাক হয়েছি কেতকীর মতো একটি অতি ভালো মেয়েকে বিয়ে করছো শুনে।"

"কি করবো," অতনু হেসে বললো, "কেতকী বড্ড বোকা। কিছুতেই বুঝলো না। তা নইলে আমায় বিয়ে করতে রাজী হয় ?"

অতনু আমায় ওর জীবনের নানাকথা এক এক সময় শুনিয়েছে। কেতকীর কথাও না বলে পারলো না। সেই বর্ষণমুখর দুপুরে

একটু একটু করে বলতে বলতে অনেক কথাই বলে ফেললো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোলো। তারপর একটু একটু করে অন্ধকার হতে হতে সন্ধ্যা নামলো। আলো জ্বলে উঠলো পাশের বাড়ি, সামনের বাড়ি, এধারের বাড়ি, ওধারের বাড়ির জানলায় জানলায়।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি থেমে এসেছিলো, আবার চেপে বৃষ্টি নামলো সন্ধ্যে হতে না হতে। আকাশে বিদ্যুত চমকাচ্ছে ঘন ঘন। থেকে থেকে গর্জে উঠছে নিকষ কালো মেঘ। অশান্ত দমকা হাওয়ায় সশব্দে খসে পড়তে চাইছে সামনের বাড়ির চিলেকোঠার চালের ঢেউ-টিন।

চা খেয়ে অতনু উঠে পড়ে গায়ে বর্ষাতি চড়ালো।

আমি বললাম, "এখন কেন? রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে যাবে। কিংবা না হয় আজ এখানেই থেকে যাও।"

"না ভাই, তা হয় না," অতনু উত্তর দিলো, "কেতকী অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।"

মাস দুয়েক আগেকার কথা। তখন অতনু সবেমাত্র কলকাতায় ফিরেছে।

নিউমার্কেটে দু-তিনটি টাই কিনে অতনু ফুলের স্টলগুলোর সামনে দিয়ে গটমট করে হেঁটে আসছে লিণ্ডসে-স্ট্রীটের দিকে বেরিয়ে পড়বে বলে এমন সময় দেখা হয়ে গেল কেতকীর সঙ্গে। কেতকী কিছু ফুল কিনে হেঁটে আসছিলো উল্টো দিক থেকে। হাতে তার গ্ল্যাডিওলা, ক্যাট্-টেল, টাইগার-লিলি আর কিছু রজনী-গন্ধা। দুজনে দুজনকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

"অতনুদা!"

"কি খবর কেতকী? ভালো আছো তো?"

অনেকদিন পরে দেখা। দুজনেই খুশী হোলো। কিন্তু অনেকদিন পরে দেখা বলে দুজনেই উপলব্ধি করলো বেশীক্ষণ কথা বলার মতো

কিছু নেই। এ ভালো, সে ভালো, অমুক কোথায় আছে, তমুকের কি খবর, এরকম মামুলী দুচার কথার পর কেতকী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আজকাল কি করছেন, অতনুদা ?"

অতনু এ প্রশ্নে একটু আহত হোলো। তবু হাসিমুখে উত্তর দিলো, "চিরকাল যা করে এসেছি তাই। ছবি আঁকছি। আর কি করবো ?"

"মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

গভীর অভিমানের অনুযোগের মতো শোনালো কেতকীর কথাগুলো। অতনু একটু অবাক হয়ে তাকালো কেতকীর দিকে। তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলো, "না ভাই, ছেড়ে দিই নি। ও শুধু নিজের কাজ থেকে মাঝে মাঝে ছুটি নেওয়া। ছবি আঁকা ছেড়ে দিলে আমার চলবে কেন ?"

"আপনার ছবির একজিবিশান করেন নি অনেকদিন।"

"এবার করবো। সম্প্রতি একটা নতুন টেকনিকে ছবি আঁকছি। কপার-প্লেটে এচিং করে নিয়ে তার থেকে নানা রঙে ডাই-প্রিন্টিং করে নতুন ধরনের একটা জিনিস। সে কী আশ্চর্য রঙের বিন্যাস, মুখে বলে বোঝানো যাবে না। একদিন দেখতে এসো," বলতে বলতে অতনু লক্ষ্য করলো ওর কথা শুনতে শুনতে কেতকীর মুখ যেন আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

হয়তো অতনু মনে করতে পারতো এই খুশী কেতকীর নিজস্ব, কিন্তু হঠাৎ চোখ পড়লো পাশের দোকানের খানিকটা করে কাচ আর খানিকটা করে আয়না দিয়ে সাজালো শো-কেসে। সেখানে দেখতে পেলো নিজের মুখ। সে মুখও আলোয় ঝলমল করছে। শিল্পীর চোখ দিয়ে অতনু দেখতে পেলো সেই আলোর নানা বিচিত্র রং। ফিরে তাকালো কেতকীর মুখের দিকে। তখন বুঝলো, কেতকীর মুখের খুশির দীপ্তি তার নিজের মুখের খুশির দীপ্তির প্রতিবিম্ব।

ঋানু শিল্পী সে। একটু চুপ করে থেকে মনের স্কেচ-বুকে মুখের

খুশির রং ধরে রাখলো কোনো ভাবী ছবির জন্যে। তারপর সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করলো, "ফ্লাওয়ার-অ্যারেঞ্জমেণ্টের নেশা তোমার এখনো আছে ?"

"আপনিই তো এই নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন," কেতকী হেসে উত্তর দিলো।

এই একটি কথায় হঠাৎ পুরোনো দিনের কয়েকটি মুহূর্তের কথা মনে পড়লো অতনুর। সে শিল্পী, অতীত তার মনকে বেদনাতুর করে তোলে কিন্তু বিষণ্ণ করে না। হাসতে হাসতে বললো, "একদিন আমার ওখানে এসো। বাড়িতেই স্টুডিও করেছি।"

কেতকী লিখে নিলো অতনুর ঠিকানা।

তারপর দুজনে দুদিকে চলে গেল।

দু-তিন দিন পরেই যে একদিন সকালবেলা কেতকী এসে উপস্থিত হবে, সে প্রত্যাশা অতনু করেনি। কাউকে আসতে বললে পনেরো কুড়ি দিন পরে যেরকম এসে বেড়িয়ে যায়, কেতকীও হয়তো তেমনি একদিন দেখা করতে আসবে,—একথাই ভেবেছিলো অতনু।

কিন্তু কেতকী এলো দু-তিন দিন পরেই। সঙ্গে করে নিয়ে এলো ওর দাদা সুরজিতকে।

অতনু সে সময় একটি বিখ্যাত বিলিতী ফার্মের ক্যালেণ্ডারের জন্যে বারোটি ছবি এঁকে দেওয়ার কাজে লেগেছিলো। সেদিন সবে তার প্রথম ছবিটি আঁকতে বসেছে।

কাজ শুরু করার মুখে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে অতনু বেশ বিরক্তি বোধ করতো। কিন্তু কেতকীকে দেখে সে খুব খুশী হোলো। কাজ বন্ধ করলো না, ছবি আঁকতে আঁকতেই গল্প করতে লাগলো সে।

এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বারোটি ছবি আঁকতে হবে তাকে। তার প্রথম ছবির বিষয়বস্তু ছিলো গাঁয়ের হাট। সবুজ, ফিকে বেগ্‌নী আর ধূসর পটভূমিকার উপর অল্প কয়েকটি

পরিমিত সহজ সরল রেখায় হাটের দিনের কোলাহল ও চাঞ্চল্য সে ফুটিয়ে তুললো তার ছবিতে। তাই দেখতে দেখতে সুরজিত বললো, "অতনুদা, তুমি কি ছবি আঁকা ভুলে যাচ্ছো, না কি ইদানিং একটু অলস হয়ে পড়ছো ?"

"কেন ?" অতনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি ছিলে দুর্ধর্ষ মডার্নিস্ট, তোমার ছবি ছিলো ইণ্টালেক্-চুয়েল, তোমার ছবি বুঝতে হোতো বিশ্লেষণ করে। কিন্তু এ ছবি যে বড্ড সহজ, এ ছবি বুঝতে বুদ্ধির দ্বারস্থ হতে হয় না, শুধু তাকিয়েই বোঝা যায়।"

অতনু তুলি নামিয়ে ফিরে তাকালো। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "শুধু তাকিয়ে বোঝা যায় ?"

"হ্যাঁ—," উত্তর দিলো সুরজিত, "এই টেকনিক তো সেকেলে।"

অতনু ছবির এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, "এটা কি ?"

"কুকুর," হেসে বললো সুরজিত, "মাটিতে মুখ নাবিয়ে কিছু একটা শুঁকছে। এতো সেকেলে টেকনিক, কুকুরকে কুকুর বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।"

অতনু কোনো কথা না বলে দু-হাত দিয়ে কুকুরের চারদিকের অন্যান্য রং ও রেখা ঢেকে জিজ্ঞেস করলো, "এবার এটা কি মনে হচ্ছে বলো তো ?"

সুরজিত তাকিয়ে দেখে নির্বাক হয়ে গেল। তিন-চারটি রেখার সমষ্টি, আর কিছু নয়। তার কোনো আকার নেই, চেনা কোনো আকারের সঙ্গে কোনো মিল নেই।

অতনু হাত সরিয়ে নিলো। পটভূমিকার ও চারপাশের বর্ণ আর রেখার বিন্যাসের মধ্যে ফিরে এসে ওই কয়েকটি অর্থহীন রেখার সমষ্টি আবার পথের কুকুরের অতি পরিচিত আকৃতিতে পরিণত হোলো।

সুরজিত অবাক হয়ে তাকালো অতনুর দিকে।

অতনু হেসে বললে, "দেখ, যদি আমার কি তোমার চারপাশের সমস্ত রং, সমস্ত রেখা, সমস্ত আকৃতি সব কিছু পুঁছে দেওয়া যেতো, তাহলে তোমায় কিংবা আমায় তুমি কিংবা আমি বলে চেনা যেতো না, মানুষ বলেই চেনা যেতো না। চারপাশের সব রং, সব রেখা, সব আলো-ছায়ার বিন্যাসের মধ্যে, এই গতিচঞ্চল জীবন-ধারার বৈচিত্র্যের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি বলে তোমার কি আমার অস্তিত্বের একটা পরিচয় আছে, তা নইলে টুকরো টুকরো ভাবে আমরা প্রত্যেকেই নিরর্থক।"

"এ আর এমন কি নতুন কথা?" বললো সুরজিত।

"কথাটা নতুন নয়," অতনু উত্তর দিলো, "কিন্তু এই কথাটা যখন আমি ছবির মধ্যে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো, তখন তো আর সেকেলে টেকনিকে চলবে না। তার একটা নতুন টেকনিক চাই। এ ছবির প্রত্যেকটি চরিত্র তুমি তার পরিবেশের রং ও রেখা থেকে আলাদা করে দেখ, 'কারো কোনো গঠন ও আকৃতি পাবে না। কিন্তু সবার মধ্যে রেখে দেখ, চোখের চেনা মনের চেনা সবই পাবে।"

সুরজিত তাকিয়ে দেখলো ছবির দিকে। একটা নতুন ছবি ফুটে উঠলো তার মনের মধ্যে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সুরজিত, তারপর বললো, "অতনুদা, মাঝখানে কয়েকটা বছর তুমি মিছিমিছি নষ্ট করলে।"

অতনু কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই কেতকী বলে উঠলো, "কিচ্ছু নষ্ট করে নি। এই কটা বছরের প্রত্যেকটা দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত অতনুদার কাজে লেগেছে। তা নইলে ওরকম ছবি ওর তুলিতে আসতো না।"

কেতকীকে এরা এতক্ষণ খেয়াল করেনি। তাকিয়ে দেখলো, কেতকী একটা লম্বা ঝাঁটা নিয়ে দেওয়ালের ঝুল সাফ করছে।

অতনু অবাক হোলো। সুরজিত হোলো গম্ভীর। বললো, "অনেক বেলা হোলো। চলো বাড়ি যাই।"

কেতকী গায়ে মাখলো না সুরজিতের গাম্ভীর্য। দেওয়ালের গায়ে ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে বললো, "একটু পরে। ঘরটা একটু সাফ করে দিই। কী কালি-ঝুল হয়েছে। এর মধ্যে মানুষ থাকে?"

পরদিন সকালে আবার উপস্থিত হোলো কেতকী। সুরজিত আর আসেনি, সে একাই। হাতে কয়েকরকম ফুল। কাঁধে একটি ব্যাগ ঝোলানো ছিলো। তার ভেতর থেকে বার করলো তিন-চারটি ফুলদানি আর পিন-হোল্ডার। বললো, "তুমি আঁকতে থাকো অতনুদা। এদিকে তাকিও না।"

অতনু নিজের কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে তিন চারটি পুষ্প-বিন্যাসে ঘরের চেহারা পাল্টে গেছে।

"বাঃ," বলে অন্যদিকে তাকালো। কিন্তু কেতকী নেই ঘরের ভিতর।

কেতকী চলে যায়নি। সে অতনুর জন্যে কফি তৈরী করতে গিয়েছিলো রান্নাঘরে। কফির সঙ্গে নিয়ে এলো কুমড়ো ফুলের বড়া।

"কফি কিরকম হয়েছে," কেতকী জিজ্ঞেস করলো।

"ভাবছি, পার্ক স্ট্রীট কি চৌরঙ্গির শৌখিন রেস্তরাঁয় কফি খেতে আর যাবো না," উত্তর দিলো অতনু।

অতনুর পরিচিতদের মধ্যে কেতকীই ছিলো একমাত্র মেয়ে যাকে নিয়ে অতনু কোনোদিন সিনেমায় কি রেস্তরাঁয় কি অন্য কোথাও বেড়াতে যায় নি। বড় জোর কোনোদিন তাকে মোড়ের

বাস-স্টপ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, এই মাত্র। এমন কি, সে যে একা তার কাছে বেড়াতে আসতো, তা নিয়েও সে কোনোদিন অন্য কিছু ভাবে নি। কেতকী আসতো, বসে বসে দেখতো তার ছবি আঁকা, কফি করে খাওয়াতো আর সেই সঙ্গে কোনো না কোনোরকম একটা খাবার। মাঝে মাঝে ফুল সাজিয়ে দিতো ফুলদানিতে।

"এটা কি ?"

"ভেল-পুরী। গুজরাতী খাবার।"

অতনু একটু ভাবলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি বুঝি আজকাল নানারকম রান্না শিখবার চেষ্টা করছো ?"

কেতকী একটু হাসলো।

"একদিন আমায় রেঁধে খাওয়াও না," বললো অতনু।

"আচ্ছা।"

"কি কি লাগবে বলে দিয়ো, আমি আনিয়ে রাখবো।"

কেতকী একটু ভাবলো, তারপর বললো, "আমাদের বাড়িতেই আসুন না একদিন। অনেকদিন তো আসেন নি।"

অতনু খুব খুশী হয়েই রাজী হোলো।

কয়েকদিন পরে কি একটা ছুটির দিন ছিলো। কেতকী সেদিন অতনুকে বাড়িতে খেতে ডাকলো।

অতনু আসতেই কেতকী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, "দাদা কি একটা কাজে বাইরে গেছে, এসে পড়বে এক্ষুনি। আপনি আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসুন।"

বারান্দা ধরে এগিয়ে যেতে প্রথমে ওদের বৈঠকখানা, তারপর কেতকীর পড়ার ঘর। অতনু ঘরে ঢুকলো পর্দা সরিয়ে।

পড়ার টেবিলের উপর একটি রঙীন কাচের বোল্। তার মধ্যে পিন-হোল্ডারে তিনটে রজনীগন্ধা আর কিছু অপরাজিতার একটা অপরূপ বিন্যাস। মাঝখানে রঙের পরিপূর্ণতার জন্যে একটি রক্তজবা।

টেবিলের পেছনের দেওয়ালে ঝোলানো অতনুর আঁকা তার নিজের একটি প্রতিকৃতি। সাধারণ একটা চারকোল-ড্রয়িং, বছর কয়েক আগে একদিন নিজের খেয়ালে এঁকে তারপর কেতকীকে উপহার দিয়েছিলো। অতনু স্তম্ভিত হয়ে দেখলো, সে ছবির উপর একটি বেলফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া।

অতনু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, বারান্দা পেরিয়ে এদিকে বৈঠকখানায় এসে একটি চেয়ারে বসে পড়লো।

মিনিট পনেরো কুড়ি পরে অতনুর খবর নিতে এসে কেতকী দেখলো অতনু বৈঠকখানায় বসে একটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে।

"আপনি এখানে কেন? আমার ঘরে গিয়ে বসতে বললাম যে! আসুন—," বলে কেতকী হঠাৎ থেমে গেল। তারপর সামনে গিয়ে বললো, "একটু দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি আসছি," বলে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল কেতকী। একটু পরে ফিরে এসে বললো, "আসুন আমার সঙ্গে।"

অতনু ঘরে ঢুকলো কেতকীর পেছন পেছন। ঢুকতেই আবার চোখ পড়লো পড়ার টেবিলের পেছনদিকের দেওয়ালে টাঙানো ছবিটির দিকে। অতনুর ছবি অতনুর দিকে তাকিয়ে যেন বাঁকা হাসি হাসলো।

অতনু তাকিয়ে দেখলো, ছবির গায়ে বেলফুলের মালাটি আর নেই।

সে নিজের মনে একটু হাসলো। তারপর নিজের মনে খুব আস্তে কপাল ঠুকে ভাবলো, "হায় ভগবান! কেতকীও?"

আমার কাছে কেতকীর রান্নার বর্ণনা করেছিলো অতনু। রান্না তো এক শিল্পকলা বটেই, সবাই জানে সে কথা, কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় তার সৃষ্টি যেমন একটি নিজস্বতায় পরিপূর্ণ হয়ে

ওঠে যার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা চলে না, তেমনি হয়েছিলো কেতকীর রান্না।

সে রান্নায় একটি মনের ছোঁয়া ছিলো,—বলেছিলো অতনু,—গান, ছবি বা কবিতার মধ্যে দিয়ে যেমনি একটা মানসিক সংযোগ গড়ে ওঠে শিল্পী আর অন্যের মধ্যে, তেমনি যেন কেতকীও নাগাল পেলো অতনুর মনের।

তার মনে হোলো এ যেন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, কোনো কথা নেই, কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো উচ্ছ্বাস নেই। শুধু ভোরের হাওয়ার মতো এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতা।

অতনুর ভালো লাগলো, কিন্তু ভয় পেলো সে। নিজেকে সে চিনতো। তার মনে হোলো, এ জিনিস তার বেশীদিন সহ্য হবে না। অনেক ভাবলো সে। প্রথমে স্থির করলো, কেতকীকে এখানে আসতে মানা করে দেবে। তারপর ভাবলো, না, সে বাড়ি বদলাবে, কেতকীকে আর ঠিকানা দেবে না। শেষ পর্যন্ত মনে হোলো, কেন এসব ছেলেমানুষী, কেতকী মাঝে মাঝে এলে ক্ষতি কি? আসবে, গল্পসল্প করে চলে যাবে, সে নিজে তার ছবি আঁকায় অনন্যচিত্ত হয়ে পড়ে থাকলেই হোলো।

শিল্পীকে যে তার সাধনার জন্যে কী দাম দিতে হয়, কে তার খবর রাখে।

দু-দিন পর অতনু আস্তে আস্তে উন্মুখ হয়ে উঠলো কেতকীর আসার প্রত্যাশায়। তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন কেটে গেল, কেতকীর দেখা নেই।

অতনু আস্তে আস্তে আরো চঞ্চল, আরো অধীর হয়ে উঠলো। তার কাজ বন্ধ হোলো না, বরং এই চাঞ্চল্য, এই অধীরতার ঝোঁকে সে পাগলের মতো ছবি এঁকে গেল,—তারপর একদিন রং তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা উপস্থিত হোলো কেতকীর বাড়ি।

দরজা খুলে দিলো সুরজিত। অতনুকে দেখে যে তার মুখের

উপর একটা ছায়া খেলে গেল সেটা অতনুর চোখ এড়ালো না। সুরজিত জোর করে মুখের উপর একটা হাসি টেনে বললো, "অতনুদা? এসো এসো। বরং, চলো বেরিয়ে পড়ি। আমায় একটা জরুরী কাজে বেরোতে হচ্ছে। খানিকটা পথ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

"কেতকী কোথায়?" অতনু জিজ্ঞেস করলো।

"কেতকী? সে বোধ হয় বাড়ি নেই।"

"ভেতরে আসুন অতনুদা," কেতকীকে দেখা গেল সুরজিতের পেছনে।

সুরজিত নিরুপায় হয়ে পথ ছেড়ে দিলো। তারপর অতনুর পেছন পেছন ঘরের ভিতর ঢুকে বললো, "দেখ অতনুদা, তুমি একটি আশ্চর্য প্রতিভা, তোমায় আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, শিল্পী হিসেবে তোমায় সম্মান করি, কিন্তু আমার কথায় কিছু মনে কোরো না, তোমার ওখানে কেতকীর যাওয়া-আসা আমাদের গুরুজনেরা পছন্দ করছেন না।"

অতনু কেতকীর দিকে তাকালো। কেতকীও তাকালো অতনুর দিকে। তারপর সুরজিতকে বললো, "দাদা, তোমার যা বলার তাতো বলা হয়েছে। এবার তুমি যাও।"

সুরজিত কেতকীর দিকে তাকালোও না, অতনুকে বললো, "চলো অতনুদা, আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

"তুমি যাও," কেতকী বললো সুরজিতকে, "অতনুদা চা খেয়ে যাবে।"

"আমরা বাইরে চা খেয়ে নেবো," বললো সুরজিত।

অতনু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমার ওখানে কেতকীর যাওয়া আসা তোমরা পছন্দ করো না কেন?"

"দেখ অতনুদা," সুরজিত একটু ইতস্তত করে বললো, "তুমি শিল্পী, তোমার জীবনযাত্রার যা ধরন তার একটা সার্থকতা তোমার

কাছে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু দেখ, তোমায় নিয়ে লোকে নানা কথা বলে। কেতকীর একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে, কথাবার্তা এগিয়েছে অনেকদূর, কিন্তু সেদিন ওদের পক্ষের একজন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, অতনুর ওখানে কি কেতকী প্রায়ই যায়? আমি অবশ্য একথা বলে কাটিয়ে দিলাম যে, যখনই যায় আমার সঙ্গেই যায়। কিন্তু এধরনের কথা ওঠা তো ভালো নয়।"

"দাদা," কেতকী এবার একটু দৃঢ় হোলো, "তুমি যাও এখান থেকে। বসুন, অতনুদা।"

অতনু কেতকীর দিকে তাকালোও না। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করলো সুরজিতকে। তারপর স্থির গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "আমার ভাবী স্ত্রীর অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করবার আস্পর্ধা তোমাদের হোলো কি করে?"

সুরজিত স্তম্ভিত হয়ে অতনুর দিকে তাকালো, তারপর বলে উঠলো, "কি বলছো অতনুদা?"

"কি বলছি তুমি শুনতে পেয়েছো। আমার ভাবী স্ত্রী আমার বাড়ি যাওয়া আসা করবে, তা নিয়ে তোমরা কথা বলার কে?"

সুরজিত কেতকীর দিকে তাকালো।

কেতকী প্রশান্ত মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

"তুই তো কোনোদিন বলিস নি," বললো সুরজিত।

"ও বলবে কেন," অতনু উত্তর দিলো, "যা বলবার আমিই বলবো বলে এসেছি।"

সুরজিত অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলো। সভ্য সমাজের মানুষ সে, অতি সভ্য ভাষায় বললো, "অতনুদা, তোমায় আমি খুব শ্রদ্ধা করি। তাই বলছি, তুমি যাও। এখানে আর এসো না। বাবা কাকা এঁরা শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি হবে। তোমার অসম্মান হবে আমার বাড়িতে এটা আমি দেখতে চাই না। তুমি যা ভাবছো তা হবে না, তা অসম্ভব। তুমি যাও।"

"আমি তো একা যাবো না, কেতকীকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাবো," বললো অতনু, "এসো কেতকী।"

কেতকী তার কাছে এসে বললো, "চলো।"

"বটে!" এবার তেড়ে উঠলো সুরজিত, "দেখি তুমি কি করে ওকে বার করে নিয়ে যাও।"

"এসো কেতকী," অতনু বললো, "দেখি কে আমাদের আটকায়।"

ভেতর থেকে কেতকীর বাবা বেরিয়ে এলেন। অতনু, সুরজিত, কেতকী, প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে সুরজিতকে বললেন, "তুমি ভেতরে যাও।" তারপর অতনুকে বললেন, "ভেতরে এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।"

সেদিন আমার কথা শুনে কেতকী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে খুব অবাক হয়েছিলো,—অতনু বলেছিলো আমায়,—কিন্তু সব চেয়ে বেশী অবাক হয়েছিলাম আমি নিজে। আমি গিয়েছিলাম দেখা করতে, ফিরে এলাম বিয়ের ঠিক করে। তারপর মাথায় হাত দিয়ে ভাবলাম, এ আমি কি করলাম। নিজের মনকে যাচাই করে কিন্তু কোনো সংশয় রইলো না। আমার মন আমারই অজান্তে এরই জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো কয়েকদিন ধরে। ওকেই আমি চাইছিলাম আমার জীবনে। সে খুব ভালো রান্না করতে পারে, ঘরদোর গুছিয়ে রাখতে পারে, কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করে মনে মনে ভালোবাসতে পারে, বেশী কথা বলে না, আমার কাজের সময় আমার কাছে থেকেও আমায় মনে মনে একলা থাকতে দিতে পারে, শিল্পীর ঘর করবার জন্যে এর চাইতে বেশী আর কি চাই?

কেতকীকে অতনু পরে জিজ্ঞেস করেছিলো, "তুমি খুব অবাক হয়েছিলে আমার কথা শুনে?"

"তেমন কিছু নয়," উত্তর দিয়েছিলো কেতকী, "আমি তো মনে মনে তাই চাইছিলাম।"

"তুমি তো আমায় জানতে দাও নি ?"

"অনেক জানতে দিয়েছি, তা নইলে তুমি বলতে পারতে না।"

অতনুর হঠাৎ মনে হোলো, আরে! এ তো এই এক মাস দেড় মাসের কথা নয়, কেতকী তাকে ভালোবাসে অনেক বছর ধরে। পুরোনো দিনের অনেক ছোটোখাটো খুঁটিনাটি যত্ন পরিচর্যা তার মনে পড়লো, যার নতুন মানে প্রতিভাত হোলো তার মনে। কেতকীকে সে জিজ্ঞেস করলো। কেতকী একটু হেসে মুখ নামিয়ে চুপ করে রইলো।

"আমার জীবনে অনিশ্চিতি খুব," অতনু বলেছিলো কেতকীকে।

সে উত্তর দিলো ছোট্টো ছুটো কথায়। অতনুর চোখে চোখ রেখে খুব স্নিগ্ধ হয়ে বললো, "আমি পারবো।"

রোমান্স বোধ হয় এরকমই,—অতনু বলেছিলো আমায়—খুব স্নিগ্ধ, খুব ঘরোয়া, খুব সহজ, সাদাসিধে। কোনো ঘটনাবৈচিত্র্য নেই, কোনো ক্লাইম্যাক্স নেই, কোনো উত্তেজনা নেই। গল্প-উপন্যাসে যা হয়, আমার জীবনে তার কোনো কিছুরই অভাব হয়নি। কিন্তু এ একেবারে অন্যরকম, আর দশজন মধ্যবিত্ত ছেলেরও বোধ হয় এমনিই হয়।

অতনুর বৌভাতে আমরা সবাই গিয়েছিলাম। কেতকী রূপসী নয়, কিন্তু আর দশজন সাধারণ মেয়েকে এদিনে যেমন খুব সুন্দর দেখায়, তেমনি অপরূপ দেখাচ্ছিলো কেতকীকে।

অতনুকে এত খুশী আমি কোনোদিন দেখিনি। তার মনের মধ্যে যেন একটা নতুন অমৃতলোক গড়ে উঠেছে।

সব চাইতে জমকালো সাজসজ্জা করেছিলো সুজাতাদি। মুখে এত রং মাখতে তাকে আমি কোনোদিন দেখিনি। খুব দামী উপহারও দিয়েছিলো কেতকীকে।

কিন্তু আমার দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি।

তার মুখে এত হাসি, বসনে ভূষণে প্রসাধনে এত রং, কিন্তু তার চোখে ফুটে উঠেছিলো তার ধূসর মনের ছায়া।

অতনু শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসেছিলো।

অতনু মজুমদার ভালো চাকরি পেয়ে গেল এক বিখ্যাত পাবলিসিটি ফার্মে। বাড়িঘর সাজিয়ে বেশ ভালো করে গুছিয়ে সংসার পেতে বসলো অতনু আর কেতকী।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা যেতাম ওদের বাড়ি।

দেখতাম, অতনু ছবি আঁকছে। ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছে কেতকী। তারই ফাঁকে ফাঁকে সেরে আসছে ঘরের কাজ। কিন্তু চুপচাপ। কোনোরকম সাড়াশব্দ পাওয়া যেতো না। দুজনের কাজের মধ্যে একটা আশ্চর্য সুরসঙ্গতি। দুজনের সান্নিধ্যে দুজনে যেন আস্তে আস্তে এক অপরূপের সন্ধান পেয়ে যাচ্ছে।

অতনুর এসময়কার জীবনে কোনো বিশেষ ঘটনা নেই। আর দশজন সাধারণ লোক যেমন সংসার করে, তেমনি দিনের পর দিন কেটে গেল ওদের দুজনের। অতনু আফিসে যেতো, বাড়ি বসে ছবি আঁকতো, মাঝে মাঝে দুচারজনকে বাড়িতে খেতে ডাকতো। একবার ছুটিতে কেতকীকে নিয়ে শিলং বেড়িয়ে এলো।

একদিনকার কথা আমার মনে আছে।

সন্ধ্যেবেলা গেছি ওদের বাড়িতে। অতনু ছিলো না। কেতকী বাড়িতে একা।

অনুযোগ করে বললো, "আজ এত করে বললাম সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। সেই প্রত্যেক দিনকার মতো সাতটা না বাজিয়ে ফিরবে না।"

সে আমায় নিয়ে বসালো বারান্দায়। বললো, "একটু বোসো পরিমলদা। আমি ওঁর পায়জামা আর পাঞ্জাবিটা ইস্তিরি করে নিই।"

ওদের বাড়িতে একটা আশ্চর্য তৃপ্তি পেতাম। ঘরদোর খুব

সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতো কেতকী। বেশ একটা পরিচ্ছন্ন শান্তিময় আবহাওয়া। ঘর-সাজানো দেখলেই বলে দেওয়া যায় এরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসে খুব। স্বামীর আরাম স্বাচ্ছন্দ্যের খুঁটিনাটির দিকে কেতকীর খুব সজাগ দৃষ্টি। প্রেমালাপ আর প্রণয়লাস্যে তো ভালোবাসা বেশীদিন বোঝানো যায় না। তার প্রকাশ পায় প্রতি মুহূর্তের ঘরোয়া কাজে কর্মে অস্তিত্বে।

কেতকী পায়জামা আর পাঞ্জাবি ইস্তিরি করে সেগুলো বাথরুমে রেখে এলো। অতনু ফিরে এসে চান করে পরবে।

"ওঁর জন্যে আজ বাদামের বরফি বানিয়েছি। একটু চেখে দেখবেন ?"

চেখে দেখে প্রশংসা তো করলাম বটেই, মনে মনে একটু ঈর্ষান্বিতও হলাম।

কেতকী আমায় বসবার ঘরে এনে বললো, "আমার আজকের ফুল-সাজানো কি রকম হয়েছে বলুন।"

তাকিয়ে দেখলাম। ঘরের টেবিলে জানলায় বইয়ের আলমারির চালে তিন চারটে ফুলদানি। আজ কোনো রঙের বাহার নেই, শুধু রজনীগন্ধা। তার মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেছে।

কেতকী বললো, "আজ আমাদের বিয়ের এক বছর হোলো। ওঁর মনে নেই। আমিও বলিনি। বলার কি দরকার! শুধু আজ ঘরটা ভালো করে সাফ করে ফুল দিয়ে সাজালাম। উনি বাদাম-বরফি খেতে খুব ভালোবাসেন। তাই তৈরী করলাম। রাত্তিরের জন্যে মুরগি রেঁধেছি। এই পরিমলদা, আজ আপনি খেয়ে যাবেন। না, না, আমি কোনো কথা শুনবো না।"

অতনু এলো। চান করে, কাপড় বদলে, আমাদের সঙ্গে চা খেতে বসলো। নানা গল্পে সন্ধ্যে কেটে গেল। একসময় উঠে গিয়ে কেতকী বিরিয়ানী তৈরী করলো। সেদিনকার বিরিয়ানী আর মুরগির স্বাদ কোনোদিনই ভুলবো না।

প্রায় ঘণ্টা তিন ছিলাম। অনেক গল্প, অনেক কথা হোলো। কিন্তু কেতকী একবারও অতনুকে বললো না যে, আজ আমাদের বিয়ের একবছর হোলো।

আমি চলে আসবার সময় অতনু আমার সঙ্গে মোড়ের ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত এলো।

ট্রাম আসেনি তখনো। আকাশে অনেক তারা। সবে শীত শুরু হয়েছে। অতনু হঠাৎ বললো, "জানিস একটা কথা ?"

"কি ?"

"আজ আমাদের বিয়ের এক বছর হয়েছে। আমি কেতকীকে বলিনি। ওর বোধ হয় মনে নেই। ওর জন্যে একটি আংটি গড়িয়ে এনেছি। রাত্তিরে ওকে পরিয়ে দেবো। কিছু আর বলবো না। বলার কি দরকার, বল ?"

ট্রাম এসে গেল। আমি চুপচাপ ট্রামে উঠে পড়লাম।

কিছুদিন পর কেতকীর একটি মেয়ে হোলো।

তার একবছর পরে অতনুর মেয়ের জন্মদিনে আমরা নেমন্তন্ন খেতে গেলাম। সেদিন তাদের বসবার ঘর ফুল আর ছবিতে আশ্চর্য সুন্দর সাজিয়েছিলো অতনু আর কেতকী। কয়েকদিন পরে দেখলাম, অতনু একটি অনবদ্য ছবি এঁকেছে। সেটি তার এক বিখ্যাত ছবি, সেটি দিয়ে বার্মা-শেল পরে তাদের ক্যালেণ্ডার করেছিলো,—দি বার্থ-ডে পার্টি।

আরও প্রায় একবছর পরের কথা।

একদিন অতনু হঠাৎ এসে উপস্থিত হোলো আমার বাড়িতে।

তদ্দিনে অতনুর খুব নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কিছুদিন আগে বম্বেতে আর মাদ্রাজে ছবির একজিবিশান করে ফিরেছে।

বললাম, "শুনছি, তুমি নাকি শিগগিরই বাইরে যাবে।"

"হ্যাঁ, ওরকম একটা কথা হয়ে আছে," অতনু উত্তর দিলো, "প্যারিসে আর লণ্ডনে আমার ছবি নিয়ে যাবো। পরে হয়তো নিউ ইয়র্কেও যেতে পারি। আমেরিকায় নর্থ ক্যারোলাইনা ইউনিভার্সিটিতে ইণ্ডিয়ান আর্টের ভিজিটিং প্রফেসরশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কথাবার্তা চলছে। সেটার ব্যবস্থা হলেই চলে যাবো বছর ছয়েকের জন্যে।"

অতনু একটু চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ বললো, "কিন্তু আমার মন ভরছে না।"

"সে কি কথা? কেন?"

"যে ছবি আঁকতে চাই সে ছবি আঁকতে পারছি না।"

"মানে?"

"তুই গীতা পড়েছিস?"

"সবটা নয়, কিছু কিছু পড়েছি।"

"অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের অধ্যায়টা পড়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

"আমি সেই বিশ্বরূপ দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারদিকের সাধারণ মানুষের মধ্যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে। কিন্তু সেই ছবি আমি আঁকতে পারছি না।"

আমি একটু অবাক হয়ে অতনুর দিকে তাকালাম।

অতনু বলে গেল, "যে ছবি আঁকছি, সে শুধু একজিবিশানের ছবি, আর্ট মিউজিয়ামের ছবি, আর্ট-ক্রিটিকের ছবি, সঙ্গতিপন্নের বসবার ঘর সাজানোর ছবি, বিলিতী ফার্মের ক্যালেণ্ডার কি গ্রীটিং-কার্ডের ছবি। তাতে আমার মন ভরছে না। আমি ছবি আঁকতে চাই সবার জন্যে।"

আমার কিছু বলার ছিলো না। অতনুদাকে আমি চিনি অনেকদিন থেকে। জানি যে, ওর মনে কোনো নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা এলে ওর মধ্যে এরকম একটা চঞ্চলতা আসে। তখন ওর

কথা চুপচাপ শুনে যেতে হয়, ওকে কথা বলতে দিতে হয়, ওর সঙ্গে কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে নেই তখন।

অতনু বিশ্বরূপদর্শন অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করে বললো, "এসব ছবিতে কি করে প্রকাশ করবো, বল? কোন রং, কোন রেখা, সাধারণ মানুষের জীবনের কোন বিচিত্র মুহূর্তের কম্পোজিশানে এই ভাব ফুটিয়ে তুলবো? আমি জানি না, কিন্তু আমায় জানতে হবে।"

দুজনেই চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর অতনু হঠাৎ খুব সহজ হয়ে বললো, "কাল আমার মেয়ের জন্মদিন। দু-চার জনকে খেতে ডেকেছি। তুইও আসবি কিন্তু। না এলে কেতকী খুব রাগ করবে।"

"মেয়েটি দু-বছরের হোলো, না?"

"হ্যাঁ, এবার তিন বছরে পড়বে। কী তাড়াতাড়ি সময় কেটে যাচ্ছে। ভীষণ দুষ্টু, কে বলবে ও কেতকীর মেয়ে?"

হাসতে হাসতে বিদায় নিলো অতনু।

পরদিন অতনুর ওখানে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটালাম। সমস্ত সময়টা অতনু তার মেয়েকে কোলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

কেতকীর মুখেও একটা সুন্দর পরিতৃপ্তির ছাপ।

তার তিনচারদিন পরে সুজাতাদির ফোন এলো,—শুনেছো পরিমল? অতনু মজুমদার পালিয়ে গেছে।

আমাদের মনে হয়েছিলো, অতনুর এই পালিয়ে যাওয়া এমন কিছু নয়। কতোবার নিজের পরিবেশ থেকে পালিয়েছে সে। তারপর আবার ফিরে এসেছে কিছুদিন পরে। যখন কেউ ভাবেনি যে,

সে ফিরে আসবে, কেতকীই আশ্বাস দিয়েছে,—ভেবো না, সে আবার ফিরে আসবে।

এবার যখন মাসখানেক পরে কেতকী তাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে গেল, তখন মনে খটকা লাগলো।

একদিন গেলাম ওদের বাড়ি।

"এখানে উঠে এলে কেন?" জিজ্ঞেস করলাম কেতকীকে। "অতনু যখন ফিরে আসবে, তখন আবার একটি বাড়ি খুঁজতে হবে না? ভালো বাড়ি খুঁজে পাওয়া কতো মুশকিল আজকালকার দিনে।"

কেতকী বিষণ্ণ হাসি হাসলো। বললো, "পরিমলদা, আপনি কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে অতনু ফিরে আসবে?"

"কেন আসবে না? এমনি কতোবার হয়েছে। তুমি তো জানো। কতোবার চলে গেছে সে। আবার ফিরে এসেছে।"

কেতকী আস্তে আস্তে বললো, "আমি জানি, এবার ও আর ফিরবে না। অতনু ছবির একটা নতুন টেকনিক খুঁজে পেয়েছে। সে আর ছবি আঁকতে পারছিলো না আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের এই পরিবেশে, তাই চলে গেল। আমি ওর খুব যত্ন করেছি, কিন্তু এত যত্নের মধ্যে কোনো শিল্পী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। সে আর এর মধ্যে ফিরে আসবে না।"

আমি চুপ করে রইলাম। ওকে কি আর সান্ত্বনা দেবো।

কেতকী বললো, "তাতে আমার দুঃখ নেই,—কিন্তু সে তো আমাকেও সঙ্গে নিতে পারতো।"

আমার কাছে একথা শুনে সুজাতা বললো,—"না ভাই, পারতো না, অতনুর কাছে এই শান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতীক হোলো কেতকী। তাই, তারই কাছ থেকে পালিয়েছে।"

"কিন্তু সে যে ভালোবাসতো কেতকীকে!"

সুজাতাদি হাসলো,—"শিল্পীর আবার ভালোবাসা। ওরা সমস্ত মানুষকে ভালোবাসে, কিন্তু কোনো একজন বিশেষ কাউকে ভালোবাসতে পারে না। ওদের মন খুব নরম, খুব কোমল,— কিন্তু ওদের মনে কোনো দয়ামায়া নেই। আর্টের জন্যে ওরা অসম্ভব নির্মম হতে পারে।" বলতে বলতে সুজাতাদির চোখ জলে ভরে উঠলো।

কেতকী এর পর আর বেশীদিন বাঁচে নি বছর খানেক পরে কি যেন একটা অসুখে ভুগে মারা গেল।

তারপর আরো কয়েক বছর কেটে গেল।

সবাই ভুলে গিয়েছিলো অতনুকে। অতনু নেই, তাই তাকে মনে রাখবার প্রয়োজনই ছিলো না।

হঠাৎ নতুন করে তাকে চিনতে শুরু করলো সবাই। যখন বিদেশীরা এসে তার ছবি কিনতে শুরু করলো, তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হোলো এদেশের আর্ট জার্নালে, তখন তার জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে শুরু করলো পুরোনো চেনাশোনারা।

সেদিন আমার কাছে একজন লেখক এসেছিলো অতনুর পুরোনো দিনের কিছু মাল্‌মশলার জন্যে। তার জীবনকাহিনী লেখা হবে।

তাকে টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা বলেছিলাম।

শুধু একটি কথা বলিনি।

কেউ জানে না।

গত বছর আমার দেখা হয়েছিলো অতনুর সঙ্গে।

কিন্তু অতনু মজুমদার এখন আর সেই আগের মানুষ নেই। তার গোত্রান্তর হয়ে গেছে।

অফিসের কাজে জীপে চেপে বি-টি রোড ধরে যাচ্ছিলাম এক ফ্যাক্টরি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে।

গাড়ির কলকব্জা হঠাৎ বিগড়ে গেল।

কাছে ছিলো একটি মোটর গ্যারাজ। গাড়ির ড্রাইভার দু-চারজন লোক ডেকে গাড়ি ঠেলে ঠেলে সেখানে নিয়ে গেল।

আমি পথের ধারে একটি পানের দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনলাম।

সিগারেট ধরাবো, এমন সময় পানের দোকানে ঝোলানো আয়নার ভিতর দিয়ে চোখে পড়লো কাছেই একটি গলির মুখে একটি সাইকেল মেরামতের দোকান।

একজন লোক একটি সাইকেলের টায়ারের পাংচার মেরামত করছে।

খুব চেনা-চেনা মনে হোলো তাকে।

হঠাৎ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

"অতনুদা!"

লোকটি মুখ তুলে তাকালো। পরনে তার খাকি হাফ প্যাণ্ট আর আধময়লা গেঞ্জি। মুখে হাতে কালিঝুলি মাখা।

তবু সে চেহারা ভুলবার নয়।

সেও চিনতে পারলো আমায়।

একটু যেন ইতস্তত করলো। তারপর বললো, "কে? পরিমল? আয়।"

চারদিক তাকিয়ে দেখলাম।

"আমারই দোকান," অতনু হেসে বললো, "আগের মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।"

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "অতনুদা, তুমি আর ছবি আঁকো না?"

"ছবি আঁকবো না!" অতনু বলে উঠলো, "বলিস কি রে! ছবির জন্যে আমি সব কিছু ছাড়লাম।" একটু তাকালো আমার দিকে। তারপর বললো, "আয় আমার সঙ্গে।"

সে আমায় নিয়ে গেল পেছন দিকের একটি ঘরে।

আধো-অন্ধকার ঘর। চারদিকে ছবি রং তুলি ছড়ানো। দেওয়াল জুড়ে টাঙানো অজস্র ছবি। দেওয়াল আর দেখা যায় না—ছোটো ছবি, বড়ো ছবি, অয়েল্ পেন্টিং, স্কেচ।

সমস্ত ছবি এই শিল্পাঞ্চলের সাধারণ লোকের জীবনপ্রবাহ নিয়ে।

পানের দোকান, চায়ের দোকানের আড্ডা,···বটতলায় দেহাতী মজুরদের ঢোলক নিয়ে গান গাওয়া,···পথের ধারে শ্রমিক-বধূ চান করছে এক বালতি জল নিয়ে।···কর্মীরা যাচ্ছে কারখানায়, আকাশে পূর্বাহ্ণের প্রদীপ্ত সূর্য।···শ্রমিকেরা ফিরে আসছে কারখানা থেকে, তাদের মুখের উপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়া।··দূরে কারখানার ধোঁয়া আকাশের গায়ে।···বি-টি রোড দিয়ে উড়ে যাচ্ছে যাত্রী বোঝাই বাস।···এমনিতরো এদের দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো ছবি নিয়ে এ সমস্ত আলেখ্য।

একপাশে ছোটো জানলা। তালগাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একফালি ধূসর আকাশ। অতনুদা সেখানে আনমনে দাঁড়িয়ে।

মনে পড়লো, কয়েকবছর আগে একদিন অতনু আমার ঘরে বসে বলছিলো, "এই যে ধর, এই শ্লোকটা—

অনাদিমধ্যান্তম অনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং
স্বতেজ সা বিশ্বমিদং তপন্তম্

এই ভাবটা যদি ছবিতে আনতে চাই, আমি কি আঁকবো?"

সে কথা ভাবতে ভাবতে ছবি দেখছিলাম।—একটা অদ্ভুত সহজ সরল নিরাড়ম্বর টেকনিক এসেছে অতনু মজুমদারের ছবিতে। খানিকটা গোগ্যাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু তা হলেও এ একেবারে আমাদের দেশের মাটির আঙ্গিক। একটা আশ্চর্য প্রাণশক্তি তার সমস্ত ছবিতে।

মনে হোলো যেন এই ছবির মধ্যে দিয়ে অতনু বলছে,—

অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

আমি নিজের মনে ভাবছিলাম, এই সব বিষয়বস্তু নিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার পরিবেশে হয়তো ছবি আঁকা যেতো, কিন্তু সে ছবি হোতো দূর থেকে দেখা ছবি, মনে হোতো না সে-ছবি আমার সামনে পেছনে আর দুপাশে। সে ছবি এত ভাবময়, এত বাঙ্ময় হোতো না, ছবিতে ধরা পড়তো না যুগান্তরের সূচনা।

আমার মনে অনেকবছরের ওপার থেকে ভেসে এলো অতনুদার মুখে শোনা শ্লোক—তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্, দীপ্তানলার্ক দ্যুতি প্রমেয়ম্···আর আমি ভাবছিলাম এই ছবি আঁকবার জন্যে নিজের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে বেরিয়ে এসে অন্য শ্রেণীতে গোত্রান্তরিত না হয়ে অতনুর উপায় ছিলো না। নিপীড়িত মানবাত্মার পরিত্রানের জন্যে যুগ থেকে যুগে যে সমাজ-অর্থনৈতিক বিপ্লব আসে, তারই যে চিরন্তন শাশ্বত বাণী—সম্ভবামি যুগে যুগে—সে কথা উপলব্ধি করবার জন্যে অতনুর এই গোত্রান্তরের প্রয়োজন ছিলো।

এমনি উপলব্ধি করেই হয়তো অর্জুন একদিন বলেছিলো,—

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ..

আমি আবার চারদিকের ছবিগুলো তাকিয়ে দেখলাম। দেখে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

গণদেবতার বিশ্বরূপ দেখতে পেয়েছে অতনুদা।

তাই তার ছবি এত প্রাণময়, এত জীবনময়।

এক বালতি জল এক হাতে ঝুলিয়ে দুটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে বাইরের দালান দিয়ে অন্য একটি ঘরে ঢুকলো এক যুবতী নারী। কালো রং, দেখতে এ অঞ্চলের অন্যান্য শ্রমিকবধূর মতোই। তবে দেহের গড়নটা খুব ভালো।

ছেলেমেয়ে দুটি কালো-কালো। গায়ে জামা নেই। শুধু ইজের পরা।

ওরা আমায় এক নজর দেখে গেল।

আমিও চোখ তুলে তাকালাম।

আমার চোখে বিস্ময় দেখে অতনু আস্তে আস্তে বললো, "ও দুটি আমার ছেলেমেয়ে। আর ও আমার বৌ। সাইকেলের দোকানের আগের যে মালিক ছিলো, তারই মেয়ে।"

আমি চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি সুখে আছো, অতনুদা ?"

একটু চুপ করে থেকে অতনু উত্তর দিলো খুব সহজ গলায়, "হ্যাঁ ভাই, আমি জীবনে যা খুঁজছিলাম, পেয়ে গেছি।"

আমি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

পেছন পেছন এলো অতনুদা।

"আমি এবার যাই।"

"আচ্ছা, এসো," অতনু বললো।

"আবার আসতে বললে না ?"

"না," শান্ত গলায় উত্তর দিলো অতনু মজুমদার।

জানতাম, অতনু পুরোনো চেনা-জানা কারো খোঁজ-খবর রাখে না, কেতকীরও না।

একবার ভাবলাম ওকে কেতকীর মৃত্যু-সংবাদ দিই। তারপর মনে হোলো, কী দরকার, ওর কাছে হয়তো ওই খবরের আর কোনো দাম নেই, প্রয়োজনও নেই।

চলে আসছিলাম।

হঠাৎ পেছন থেকে অতনু ডাকলো।

"পরিমল!"

ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ?"

"বুলা এখন কত বড়ো হয়েছে ?"

অতনুদার মেয়েটির নাম বুলা, যাকে দু-বছরের রেখে অতনু চলে গিয়েছিলো।

বললাম, "এখন সে বছর ছয়েকের হয়েছে।"

"অতো বড়ো হয়ে গেছে?" ঝলমল করে উঠলো অতনুদার মুখ, "ও ভালো আছে তো?"

"হ্যাঁ, ভালোই আছে," আমি উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা," বলে অতনুদা দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

আমি হেঁটে চলে গেলাম অনেকখানি পথ।

তারপর ফিরে তাকালাম।

তাকিয়ে দেখি, দোকানের ভিতর বসে সাইকেল মেরামত করছে অতনুদা।

জীপের সামান্য গোলমালটা মেরামত করা হয়ে গেছে। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো পথের ধারে।

জীপের ভিতর উঠে বসলাম। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

—শেষ—